সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

০৮ জানুয়ারি ২০২৪ ◈ সোমবার ◈ বর্ষ: ৬৫ ◈ সংখ্যা: ১৫-১৬

www.weeklyarafat.com

কিং সউদ বিন আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি ফর হেলথ সায়েন্স, সৌদি আরব

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনি কি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়তে চান?
তাহলে নিয়মিত পড়ুন : মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
সাপ্তাহিক আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ও কুরআন- সুন্নাহ'র আলোকে রচিত জমঈয়ত প্রকাশিত বইসমূহ

যোগাযোগ
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪, মোবইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
www.jamiyat.org.bd

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৫
* সংখ্যা : ১৫-১৬
* বার : সোমবার

◈ ০৮ জানুয়ারি-২০২৪ ঈসায়ী
◈ ২৪ পৌষ-১৪৩০ বঙ্গাব্দ
◈ ২৫ জমাদিউস্ সানি-১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس : العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة :

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة :

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير : أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা : (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

“সাপ্তাহিক আরাফাত”

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০৩
- **আল কুরআনুল হাকীম :**
  - ❖ **সত্য অস্বীকার করার পরিণতি**
    আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন- ০৪
- **হাদীসে রাসূল ﷺ :**
  - ❖ **আল্লাহ যাদের সাথে কথা বলবেন না**
    আবূ তাহসীন মুহাম্মদ- ০৭
- **প্রবন্ধ :**
  - ❖ **সবর যেভাবে করা উচিৎ**
    অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ১১
  - ❖ **যিহার : পরিচয়, কাফফারা এবং এ সংক্রান্ত জরুরি বিধি-বিধান**
    আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল- ১৪
  - ❖ **রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা**
    মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি
    ভাষান্তর : তানযীল আহমাদ- ১৭
  - ❖ **সালাফি মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা**
    শাইখ ড. সালেহ বিন ফাওযান আল ফাওযান (হাফিযাহুল্লা-হ)
    অনুবাদক : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার- ২২
- **পরিবেশ-প্রকৃতি :**
  - ❖ **দূষণচক্রে জেরবার : উৎকণ্ঠায় নগরবাসী**
    আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২৪
- **ক্বাসাসুল হাদীস :**
  - ❖ **মু'মিনের 'ইবাদত ধ্বংসের ফাঁদ 'রিয়া'**
    গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ২৭
- **বিশেষ মাসায়িল** ২৮
- **সমাজচিন্তা :**
  - ❖ **চাহিদা যখন সরকারি চাকরিজীবী পাত্র**
    সাইফুল্লাহ ত্রিশালী- ৩০
  - ❖ **হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?**
    সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমেদ- ৩৪
- **নিভৃত ভাবনা :**
  - ❖ **শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম**
    মো. কায়ছার আলী- ৩৮
- **স্বাস্থ্য সচেতনতা** ৪০
- **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** ৪২
- **প্রচ্ছদ রচনা** ৪৭

সম্পাদকীয়

নতুন শিক্ষাবর্ষে নৈতিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জ

মানুষের বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো শিক্ষা। মানুষ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে চারিদিকের পরিবেশ এবং সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। দুনিয়ার ও আখিরাতের জীবনে সম্মানিত হতে হলে নৈতিকমূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এছাড়াও শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়াতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল সেটা বুঝার সক্ষমতা লাভ করে। মানুষ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে তার চরিত্র সুন্দর করতে পারে ও বিবেককে জাগ্রত রাখতে পারে। সঠিক জ্ঞানচর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ বিবেকের জ্যোতিতে নিজেকে এবং সমাজকে আলোকিত করতে পারে। এ শিক্ষা ওহীর আলোয় উদ্ভাসিত স্বচ্ছ ও খাঁটি। এ জন্য চাই মহান আল্লাহর তাওফীক্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন। আর যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা জ্ঞানবান।"

সুস্থ বিবেক মানুষের সৌন্দর্য্যের প্রতীক। সুস্থ বিবেক বিকাশে নৈতিক শিক্ষার বিকল্প নেই। যুগে যুগে গুণীজনের অর্জিত সম্মানের পিছনে রয়েছে তাঁদের শিক্ষা, যা তাঁরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করেছেন। আর তাঁরা তাদের অর্জিত শিক্ষা মানুষের কাছে বিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁদেরকেই বলা হয় প্রকৃত মানুষ গড়ার কারিগর। এক্ষণে যাঁরা কারিগর তাঁরা যদি নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থায় সনদধারী হন এবং আল্লাহভীরুতার বদলে লৌকিতা ও জাগতিক স্বার্থই মুখ্য হয়, তাহলে এরূপ ব্যক্তির কাছে জ্ঞান চাওয়া আর অরণ্যেরোদন করা একই কথা। তাঁদের মতো শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা জাতির প্রত্যাশা পূরণ হবে না। আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করছি যে, দিন যত যাচ্ছে ততো শিক্ষার অবনতি ঘটছে। মানুষ ভুলে যাচ্ছে শিক্ষার গুরুত্ব। দুনিয়া থেকে ধীরে ধীরে নৈতিক শিক্ষার বিলপ্তি ঘটছে। আর সে জন্য একে অপরের সাথে সদাচরণ বা সৎব্যবহার করা ভুলে যাচ্ছে। শিক্ষার অবনতির কারণে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের অভাব দেখা দিচ্ছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে। তাই মানুষের উচিৎ দীনী শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়া। শিক্ষা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করা এবং নিবেদিতপ্রাণ হওয়া, যাতে করে শিক্ষার মাধ্যমে তারা সমাজকে, দেশকে ও বিশ্বকে পরিশুদ্ধ করতে পারে এবং মানব জাতিকে সুশৃঙ্খল করতে পারে। মানুষের উচিৎ সালাফগণের মতো শিক্ষা অর্জন করা, যাতে করে তারা শিক্ষার আলোয় দুনিয়াকে আলোকিত করতে পারে, দুনিয়ার মানুষকে সভ্যতা শিখাতে পারে। আর এই শিক্ষার দ্বারা যেন গড়ে উঠে সভ্যতার নতুন প্রজন্ম।

কিন্তু বর্তমান শিক্ষা কারিকুলাম কি আমাদের সে লক্ষ্য পূরণে সক্ষম? আমরা মুসলিম বাংলাদেশি। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলাম ও দেশীয় কাল্‌চারের সমন্বিত রূপের অনুশীলন আবশ্যক। তা না হলে মানুষ ইসলামী মূল্যবোধ ও অপসংস্কৃতির মধ্যকার পার্থক্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। ফলে আদর্শ ও নৈতিকগুণ সম্পন্ন দেশপ্রেমিক সু-নাগরিক গড়ে ওঠবে না। আর এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন, চুরি, ডাকাতি, লুন্টন, ব্যভিচার ও অরাজকতা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। অতএব, ২০২৪ শিক্ষা বর্ষের সূচনায় আমাদেরকে উপর্যুক্ত বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। যথাসম্ভব এ বছর প্রকৃত শিক্ষিত জাতি গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করতে হবে এবং আগামী বছরের জন্য সুন্দর পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। আমরা এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি। ❑

আল কুরআনুল হাকীম

সত্য অস্বীকার করার পরিণতি

–আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوْا بِعَهْدِيْ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۞ وَآمِنُوْا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ۞ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

সরল অর্থানুবাদ

"হে বানী ইস্রাঈল! তোমরা স্মরণ করো আমার সে নিয়ামতের কথা যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। আর তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করো, তাহলে আমি তোমাদের জন্য যে ওয়াদা করেছি, তা পূরণ করব এবং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো। আর তোমরা ঈমান গ্রহণ করো সে কিতাবের প্রতি, যা আমি তোমাদের কাছে সত্য সহ নাযিল করেছি। বস্তুতঃ তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী (কাফির) হয়ো না এবং আমার আয়াতসমূহ স্বল্পমূল্যে বিক্রি করো না। আর আমাকেই তোমরা ভয় করো। তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জেনে-বুঝে সত্যকে গোপন করো না।"[১]

দারস-এর প্রেক্ষাপট

বানী ইস্রাঈলকে আল্লাহ তা'আলা তার প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের ও কৃত ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের বলে তারা জগতে যশ-খ্যাতি অর্জন করেছিল। আবার তার নিয়ামতের কুফ্রীর ফলে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল– তা স্মরণ করলে সহজেই তারা অনুসূচনা করতে পারবে। আর মহান আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা অনুযায়ী দ্রুত তার নির্দেশ মানবে– এ লক্ষ্যে তাদেরকে এসব নিয়ামতের কথা স্মরণ করানো। এটি দা'ওয়াতে অন্যতম একটি কৌশল। আল্লাহ তা'আলা সে কৌশল অবলম্বন করে এ জাতিকে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুসরণ করার এবং ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা বন্দেগীর আহ্বান জানান।

বানী ইস্রাঈল কারা?

ইস্রাঈল হিব্রু ভাষার শব্দ। অর্থ- মহান আল্লাহর বান্দা বা দাস। এটি মহান আল্লাহর নবী ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)-এর উপাধি। সাহাবী ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইয়াহূদীদের একটি দল নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি (ﷺ) তাদেরকে বললেন : তোমরা কি জানো, ইস্রাঈল হলেন ইয়াকুব। তারা বলল : হে আল্লাহ! সত্যিই তো। অতঃপর নবী (ﷺ) বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।[২]

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾

"তোমরা স্মরণ করো, আমার সে নিয়ামতের কথা, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি।"

এ আয়াতাংশে বানী ইস্রাঈল-এর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত সকল নিয়ামতই উদ্দেশ্য। কিছু নিয়ামতের কথা বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ দ্বারা আমরা জানতে পারি। আবার এমন কত নিয়ামত রয়েছে, যার বিবরণ আমরা জানি না। প্রদত্ত নিয়ামতের মধ্যে পাথর থেকে পানির ঝরণা নির্গত হওয়া, মান্না ও সালওয়া নামক আসমানী খাবার নাযিল করা এবং ফিরআউনের দাসত্ব হতে মুক্তিদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৩]

আসমানী কিতাব নাযিল ও নবী প্রেরণ অন্যতম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

* *সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত। সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস।*

[১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ৪০-৪২।*

[২] *সুনান আবূ দাউদ- হাদীস নং- ৩৫৬।*

[৩] *ইমাম ইবনু জারীর- তাফসীর আত্ ত্বাবারী, ১/৫৫৬।*

﴿يَا قَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكًا وَآتَاكُمْ مَالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "হে জাতি! তোমরা স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের কথা– যখন তিনি তোমাদের মাঝে নবীগণ পাঠালেন এবং এমন রাজত্ব দিলেন, যা জগতের কাউকে দেয়া হয়নি।"[৪]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বাচনিক উক্ত নিয়ামতের মধ্যে স্মরণীয় হলো ফিরআউন ও তার জাতি কর্তৃক লোমহর্ষক নির্যাতন থেকে নাজাত দান করা।[৫]

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَأَوْفُوْا بِعَهْدِىْ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ﴾

"আর তোমরা পুরা করো আমার সাথে কৃত ওয়াদা, তবে আমি তোমাদের ওয়াদা পূরণ করব।"

আয়াতাংশে মহান আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা বলতে– তাঁর প্রতি ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর ঈমান আনা এবং তাঁর শরীয়াত বাস্তবায়ন করাকে বুঝায়।[৬] এই ওয়াদা আরো স্পষ্ট হয়েছে মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীতে। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللهُ إِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ﴾

অর্থ : "আর আল্লাহ বানী ইস্রাঈল এর কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং আমি (আল্লাহ) তাদের মধ্য থেকে ১২জন দলপতি নিযুক্ত করেছিলেন। আর আল্লাহ বলেছিলেন– আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা সালাত ক্বায়েম করো, যাকাত দাও, অতঃপর, রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো, তাদের সাহায্য করো এবং আল্লাহকে উত্তম উপায়ে ঋণ দাও, তাহলে অবশ্যই আমি (আল্লাহ) তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিব এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব- যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়। অতঃপর, সেটার পর তোমাদের মধ্যে যে কাফির হয়, সে নিশ্চয়ই সরলপথ বিচ্যুত।"[৭]

উক্ত আয়াতে কারীমা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, বানী ইস্রাঈল-এর কাছ থেকে আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে ওয়াদা নিয়েছেন। আর তা হলো– ১. সালাত ক্বায়িম করা, ২. যাকাত প্রদান করা, ৩. নবী-রাসূলদের উপর ঈমান আনা, ৪. নবী ও রাসূলদের সাহায্য করা, ৫. মহান আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়া।

অন্যান্য ভাষ্যকার বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে এ মর্মে ওয়াদা করেছিলেন যে, তিনি ইব্রা-হীম (আলাইহিস সালাম) পুত্র ইসমা'ঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশে এক মহান নবী পাঠাবেন। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুহাম্মাদ (ﷺ)। অতএব, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমান এনে তার আনুগত্য করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জান্নাত দান করবেন।[৮]

যাহ্হাক ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বাচনিক বর্ণনা এভাবে উল্লেখ করেন যে, বানী ইস্রাঈল যদি তাদের ওয়াদা পূরণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওয়াদা পূরণ করবেন। এর অর্থ হচ্ছে– আমি (আল্লাহ) তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাব এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[৯]

মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ...﴾

"আর তোমরা হক্বকে বাতিলের সাথে মিশ্রণ করো না...।"

আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বানী ইস্রাঈল তথা ইয়াহূদীদেরকে তাদের সচরাচর রীতি অনুযায়ী হক্বকে

---

[৪] *সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ২০।*

[৫] *আল-মিসবাহুল মুনির ফী তাহযীব, তাফসীর ইবনু কাসীর- দারুস সালাম, রিয়াদ/৫৫।*

[৬] *শাইখ 'আবদুর রহমান আস্ সা'আদী, তাইসীরুল কারীমির রহমান, মুয়াস্সামাতুর রিসালাহ- বাইরুত/৫০।*

[৭] *সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ১২।*

[৮] *মিসবাহুল মুনীর- দারুস সালাম, রিয়াদ/৫৫।*

[৯] *ইবনু আবী হাতেম- ১/১৪৩।*

বাতিলের সাথে মিশানোর ন্যায় গর্হিত কাজ হতে নিষেধ করেছেন। তাদের আরও একটি বদভ্যাস ছিল, তারা জেনে-বুঝে হক্ব গোপন করত এবং বাতিল ও অহেতুক বিষয় প্রকাশ করত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এ দু'টি অপরাধ থেকে বারণ করলেন। সাথে সাথে হক্ব প্রচার ও প্রসার করতে নির্দেশ দিলেন।[১০]

যাহ্হাক ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন– মহান আল্লাহর বাণী : "আর তোমরা হক্বকে বাতিলের সাথে মিশ্রণ করো না।" অর্থ- তোমরা হক্ব বাতিলের মিশ্রণ ঘটাবে না এবং সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশাবে না।[১১]

ক্বাতাদাহ্ বলেন, তোমরা ইয়াহূদী-খ্রিষ্টবাদকে ইসলামের সাথে মিশাবে না। অথচ তোমরা জানো যে, মহান আল্লাহর দীন হচ্ছে ইসলাম। আর ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টবাদ বিকৃত, মহান আল্লাহর আবিমিশ্রিত দ্বীন নয়।[১২]

হক্ব গোপনের পরিণাম

ইতোপূর্বে আমরা অবগত হয়েছি যে, হক্ব গোপন করা ইয়াহূদীদের বৈশিষ্ট্য ও জঘন্য অপরাধ। আল কুরআন এর পরিণতি সম্পর্কে বলেছে–

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِيْ الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ﴾

"নিশ্চয়ই যারা গোপন করে আমি যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও হিদায়ত নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনার পরও, সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিশাপ এবং অন্যান্য অভিশাপকারীদেরও অভিশাপ।"[১৩]

প্রখ্যাত সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান :

«مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি কোন 'ইল্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর, তা গোপন করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মুখে জাহান্নামের আগুনের লাগাম লাগিয়ে দিবেন।[১৪]

বর্তমান সমাজে যে সকল 'আলেম দল পরস্তি বা ইমাম ভক্তির অযুহাতে কুরআন ও সহীহ হাদীসকে গোপন করেছেন কিংবা অনুসরণীয় ইমাম-এর উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে মানুষকে হক্ব থেকে দূরে রাখছেন। তাদের পরিণতি নিয়ে একটু ভাবা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সুবুদ্ধির উদয় দিন –আমিন।

দারসের শিক্ষাসমূহ

০১. নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে মহান আল্লাহর পথে আহ্বান করা কুরআনিক কৌশলের অন্যতম। এটা মানুষের মনে দ্রুত প্রভাব ফেলে।

০২. যারা মহান আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর যুগ পাওয়ার পরও তার প্রতি ঈমান আনবে না, তারা মহান আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গকারী হিসাবে গণ্য হবে।

০৩. ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) ও তার পরবর্তী নবী রাসূল (আলাইহিস সালাম)-দের অনুসৃত পথের উপর বর্তমান ইস্রাঈল সম্প্রদায় নেই। তাই তাদেরকে ইস্রাঈল না বলে ইয়াহূদী বলাই ভালো।

০৪. যে ব্যক্তি প্রথম কুফ্রী করবে বা কোনো গোমরাহীর পথ দেখাবে, তার দেখাদেখি যত লোক এই অপরাধ করবে ততলোকের সমপরিমাণ পাপ ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাবে।

০৫. সত্য গোপনকারী ব্যক্তি মহান আল্লাহর অভিশাপের পাত্র। শুধু তাই নয়; আল্লাহ তা'আলা যত সৃষ্টিকে অভিশাপ করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তাদের সকলের লানত বা অভিশাপ পাবে।

অতএব, আসুন! আমরা সত্যের সেবক হই। তা প্রচার ও প্রসারের কাজে যথাসাধ্য সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করি। দুষ্টমতি ইয়াহূদীদের খপ্পরে পা না দেই; বরং মহান আল্লাহকে বেশি বেশি ভয় করি এবং তাঁর রাসূলের (ﷺ) অনুসরণ করে জান্নাতের পথে চলি।

«والله هو الموفق والهادى إلى سواء السبيل».

---

[১০] *হাফিয ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসীর- তাফসীরুল কুরআনিল আজীম।*
[১১] *ইমাম ইবনু জারীর আত্ তাবারী- তাফসীর আত্ তাবারী- ১/৫৬৯।*
[১২] *ইবনু আবী হাতিম- ১/১৪৭।*
[১৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৫৯।*
[১৪] *সুনান আবূ দাউদ- মাকতাবাতুশ্ শামেলা, হা: ৩৬৫৮, হাসান সহীহ।*

হাদীসে রাসূল ﷺ

আল্লাহ যাদের সাথে কথা বলবেন না

–আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ : خَابُوْا وَخَسِرُوْا، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

সরল অনুবাদ

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। রাসূল (ﷺ) বলেন তিন প্রকার মানুষের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে কথা বলবেন না। তাদের দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। রাসূল (ﷺ) তার একথাটি তিনবার বললেন। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন : ধ্বংস এবং ক্ষতিগ্রস্ত তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)? আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, ১ম প্রকার মুসবিল অর্থাৎ- যারা টাখনুর নিচে পরনের বস্ত্র ঝুলিয়ে পরিধান করে। ২য় প্রকার মান্নান অর্থাৎ- যারা দান করে দানের কথা বলে খোটা দেয়। ৩য় প্রকার যারা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে তার পন্য বিক্রয় করে।[১৫]

হাদীসের রাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম জুনদুব ইবনু জুনাদাহ/বুরাইয়া। উপনাম আবূ যর। এ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। পিতার নাম জুনাদাহ। গিফার গোত্রের লোক হিসেবে তাঁকে আল গিফারী বলা হয়।

জন্মগ্রহণ : তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায়নি। তবে তিনি জাহেলী যুগের কোনো এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি রাসূল (ﷺ)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মানাযির আহসান গিলানী তাঁকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পঞ্চম বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ যর গিফারী নিজেই তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলেন, যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিল আমি তাদের চার জনের মধ্যে চতুর্থ, কিন্তু সিয়ার প্রণেতাগণ তাঁকে পঞ্চম মুসলমান বলে অভিহিত করেছেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ : বদর, উহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর পঞ্চম হিজরিতে তিনি মদিনায় আগমন করেন। তবে তিনি তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রাসূল (ﷺ)-এর সাহচর্য ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : মদিনায় অবস্থানকালে তিনি সর্বক্ষণ রাসূল (ﷺ)-এর খিদমতে নিয়োজিত থাকতেন। রাসূল (ﷺ) তাঁকে মুনযির ইবনু আমরের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন। 'যাতুর রিকা' যুদ্ধে যাত্রাকালে রাসূল (ﷺ) তাঁকে মদিনার আমীর নিযুক্ত করেন।

বাসস্থানের রদবদল : জীবনের শেষ বয়সে তিনি কয়েকটি স্থান রদবদল করেন। যেমন- 'উমারের খেলাফতকালে মদিনায়, 'উসমানের খেলাফতকালে সিরিয়ায়, মু'আবিয়ার সাথে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার মাসয়ালায় বিরোধ হলে পুনরায় সিরিয়া ছেড়ে মদিনায় চলে যান। অতঃপর মদিনার 'রাবাযা' পল্লীতে আমরণ নির্জনে বসবাস করেন।

গুণাবলি : তিনি একজন সাধক, কোমলমতি ও অমায়িক লোক ছিলেন। মিতব্যয় এবং সংযম ছিল তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ ছিলেন।

হাদীসশাস্ত্রে অবদান : তিনি রাসূল (ﷺ) থেকে সর্বমোট ২৮১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ৩১টি হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে উল্লেখ করেন। এককভাবে ইমাম বুখারী ২টি এবং ইমাম মুসলিম ১৭টি হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু : এ মহান সাহাবী 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফতকালে ৩২ হিজরির ৮ যিলহজ্জ মদিনা থেকে ৪০ মাইল দূরে 'রাবাযা' নামক পল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। তাঁকে 'রাবাযা' নামক পল্লীর নির্জন প্রান্তরেই সমাহিত করা হয়।

---

[১৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১/১০৬; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪০৮৭; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১২১১; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ২৫৬৩; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২২০৮।*

হাদীসের ব্যাখ্যা

তিন প্রকার মানুষের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে কথা বলবেন না। তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাদের ১ম প্রকার হলো যারা টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করেন।

পোশাক মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলার দেওয়া একটি নিয়ামত। এর মাধ্যমে মানুষের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব ফুটে ওঠে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا بَنِيْ آدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ﴾

"হে বানী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদের পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাক্বওয়ার পরিচ্ছদ; এটাই সর্বোৎকৃষ্ট। এটা আল্লাহর নিদর্শনমূহের অন্যতম– যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"[১৬]

পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে শালীনতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন বিধি-নিষেধের কথাও জানিয়েছেন রাসূল (ﷺ)।

আল্লাহ তা'আলার নিকট পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় পরিধান করা বড়ই গুনাহের কাজ, অথচ লোকজন এই বড় গুনাহকেও তুচ্ছজ্ঞান করে সর্বদা তাদের পড়নের প্যান্ট, পায়জামা, লুঙ্গি, ট্রাওজার পায়ের গোড়ালীর নীচে ঝুলিয়ে রাখে। কারো কারো কাপড়তো আবার মাটিও স্পর্শ করে। পরনের কাপড় গোড়ালীর উপর পরাকে লজ্জাজনক মনে করে। যে ব্যক্তি বলে যে, আমার পরিধানের কাপড় গোড়ালির নিচে গেলেও তা অহংকারবশত নয়। সে প্রকৃতপক্ষে নিজের আত্মার প্রশংসা করছে যা কোনো মতেই গ্রহণীয় নয়। শাস্তির ঘোষণা হলো আম বা ব্যাপ্ত, কেউ অহংকারবশত করুক বা নাই করুক। যেমন- রাসূল (ﷺ) বলেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেন, পরিধানের কাপড় পায়ের গোড়ালীর নীচে যে পরিমাণ যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে।[১৭]

আর যদি কেউ অহংকারবশতঃ কাপড় ঝুলায় তাহলে তার শাস্তি হবে আরো কঠোর এবং ভয়াবহ যেমনটি নবী করীম (ﷺ) বলেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিবেন না যে অহংকারবশতঃ তার পড়নের বস্ত্র টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করে।[১৮]

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ : إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِي النَّارِ، قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, মু'মিনের কাপড় থাকবে তার অর্ধগোছা পর্যন্ত, তবে টাখনু ও গোছার মাঝামাঝি থাকলে কোনো দোষ নেই। কাপড় টাকনুর যে পরিমাণ নীচে যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে। কথাটি রাসূল (ﷺ) তিন বার বলেছেন। যে ব্যক্তি অহংকারবশত পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার দিকে কিয়ামতের দিনে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।[১৯]

২য় প্রকার– যারা দান করে খোটা দেয় : ইসলামে পরোপকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঈমানের দাবি এবং আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত পছন্দনীয় কাজ। দান করা আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদতগুলোর অন্যতম একটি 'ইবাদত এবং সৎকর্মপরায়ন বান্দার ভালো গুনাবলী। একজন ব্যক্তি কম বেশি ছোট-বড় যা কিছুই সে দান খয়রাত করে তা আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করেন, বিনিময়ে তিনি তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيْرَةً وَلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

---

[১৬] *সূরা আল আ'রাফ : ২৬।*

[১৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৮৭; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৫৩৩১।*

[১৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৭৮৮; সহীহ মুসলিম- হা. ২০৮৫; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪০৯৬; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৫৭৩।*

[১৯] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৪০৯৩, আলবানী সহীহ।*

"আর ছোট-বড় যা কিছু তারা ব্যয় করে এবং যত প্রান্তর অতিক্রম করে তা তাদের জন্য লিখিত হয়, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।"[২০]

আল্লাহ তা'আলা বান্দার সে দান খয়রাতকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন যেমন বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন। কিন্তু আল্লহ তা'আলার পক্ষ হতে দান খয়রাতের উত্তম বিনিময় এবং তা বহুগুণে বাড়িয়ে পাওয়া তখনই সম্ভব যখন দানকারী তার দানের মাধ্যমে কোনো অবস্থাতেই দানগ্রহীতাকে কষ্ট দিবে না এবং খোঁটা দিবে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾

"যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তৎপর যা ব্যয় করে তজ্জন্য কৃপা প্রকাশ করে না, কষ্ট দানও করে না, তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকটে পুরুস্কার রয়েছে।"[২১]

এ আয়াতে জানানো হচ্ছে– আল্লাহর পথে কৃত ব্যয়ের সুফল লাভের জন্যে শর্ত হলো, পরবর্তীকালে সেই দানের জন্য কোনোরূপ খোঁটা না দেওয়া এবং কোনো কষ্ট না দেওয়া। বলা বাহুল্য, কোনো দান আল্লাহর পথে হয় তখনই, যখন তাতে ইখলাস থাকে। তাহলে এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, কেবল দানকালীন ইখলাসই যথেষ্ট নয়; বরং দানের পরও ইখলাস রক্ষা জরুরি। খোঁটা দেওয়া ইখলাসের পরিপন্থী। কেননা খোঁটা দেওয়াই হয় পার্থিব প্রত্যাশা পূরণ না হলে।

খোঁটা দ্বারা কেবল দান-খয়রাত ও পরোপকারের সওয়াবই নষ্ট হয় না; বরং এটা একটা কঠিন পাপও বটে। কেননা এর দ্বারা উপকৃত ব্যক্তির অন্তরে আঘাত দেওয়া হয়। মানুষের মনে আঘাত দেওয়া কবীরা গুনাহ। সুতরাং খোঁটা দেওয়া ইসলাম ও ঈমানের সংগে সংগতিপূর্ণ নয়। কেননা মুসলিম তাকেই বলা হয় যার হাত ও মুখ থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।[২২]

আর মু'মিন সেই, যার ক্ষতি থেকে সকল মানুষ নিরাপদ থাকে[২৩]। এজন্যেই খোঁটা দেওয়াকে কুরআন মাজীদে কাফির-বেঈমানের কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

﴿يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللهُ لَا يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ওই ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না, যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর, যার ওপর কিছু মাটি থাকে। অতঃপর তার ওপর প্রবল বৃষ্টিপাত ওকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে, তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[২৪]

খোঁটা দেওয়া কাফিরদেরই বৈশিষ্ট্য। তারা যেহেতু আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাই সওয়াবেরও কোনো আশা থাকে না। আশা থাকে কেবল নগদপ্রাপ্তি। হয় সে ব্যক্তি তাকে আরও বেশি দেবে, নয় তার অনুরূপ উপকার তারও করবে। অন্ততপক্ষে তার গুণগান করে তো বেড়াবেই। যখন এর কোনোটা পায় না, তখন মনে করে– বৃথাই টাকা-পয়সা নষ্ট করল। এভাবে সে হতাশার শিকার হয় আর নিমকহারাম, অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি বলে গালাগাল করে। এখন মু'মিন-ব্যক্তিও যদি খোঁটা দিয়ে বসে, তবে তা কাফিরসুলভ আচরণই হলো। এর দ্বারা প্রমাণ হবে– দান বা উপকার করার সময় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি তার উদ্দেশ্য ছিল না।

খোঁটা দেওয়া একরকম অহমিকাও বটে। কারণ এর দ্বারা সে যাকে উপকার করেছে, তাকে নিজ কৃপাধন্য মনে করে। তাকে হীন ও ছোটভাবে। অথচ দান-উপকার করা চাই ব্যক্তির মান-সম্ভ্রমের প্রতি লক্ষ্য রেখেই। এমনকি আল্লাহ তা'আলার কাছে বিশেষ কোনো 'আমলের কারণে সে তার মতো বহু দান-খয়রাতকারী অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা রাখে। তাই উপকার করা উচিত সেবার মানসিকতা নিয়ে। অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে। ভাবা উচিত তাকে উপকার করে প্রকৃতপক্ষে নিজে উপকৃত হচ্ছে। দান-উপকার গ্রহণ করে সে তাকে মহান আল্লাহর কাছে বিপুল মর্যাদালাভের সুযোগ করে দিচ্ছে। যেই উপকারের সাথে এরকম মানসিকতা থাকে, খোঁটা দেওয়ার মতো হীনতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

---

[২০] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১২১।*
[২১] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬২।*
[২২] *সহীহুল বুখারী- হা. ১০; সহীহ মুসলিম- হা. ৪১।*
[২৩] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১২৫৬১।*
[২৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৬৪।*

আসলে খোঁটা দেওয়া একরকম ধৃষ্টতা। কারণ মানুষ খোঁটা কেবল তখনই দেয়, যখন উপকার করতে পারাকে নিজ কৃতিত্ব গণ্য করে, মহান আল্লাহর দান ও তাওফীক্বের দিকে দৃষ্টি না থাকে। কেবল সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকলেই তো উপকার করা যায় না। এর জন্য মহান আল্লাহর তাওফীক্বের দরকার হয়। দান করার পরে খোঁটা দিলে সেই তাওফীক্বের অমর্যাদা করা হয় এবং করা হয় অকৃতজ্ঞতা। এই অকৃতজ্ঞতা ও ধৃষ্টতার কারণেই তো কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ তা'আলার সুদৃষ্টি, সুবাক্য ও পরিশোধন থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং তাকে ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি।

৩য় প্রকার– যারা মিথ্যা শপথের মাধ্যমে তার পন্য বিক্রয় করে : মিথ্যা মানবতাবোধকে লোপ করে, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়। মিথ্যাবাদীর উপর মহান আল্লাহর অভিশাপ। মিথ্যা বলে বা মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। একজন বিক্রেতা তার পন্য বিক্রয় করার সময় অনেকভাবে ক্রেতার সাথে প্রতারণা করতে পারে। পন্যের গুনগত মান গোপন করার মাধ্যমে, ভালো পন্য দেখিয়ে খারাপ পন্য দেওয়ার মাধ্যমে, মিথ্যা শপথের দ্বারা বেশি মূল্য গ্রহণের মাধ্যমে, ওজনে কম দেওয়ার মাধ্যমে। একজন ক্রেতা যেভাবেই হোক বিক্রেতার দ্বারা প্রতারিত হলে মহান আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কঠোর ভাষায় তাকে ধিক্কার দিয়েছেন।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা কোনো এক খাদ্যস্তুপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি তাঁর হাত ঐ খাদ্যের মাঝে প্রবেশ করান এবং তার হাত ভেজা পেলেন। তখন তিনি (ﷺ) বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? তখন খাদ্য বিক্রেতা বলে, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! বৃষ্টিতে তা ভিজেছে। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, কেন তুমি সে খাদ্যগুলোকে উপরে রাখলে না? যাতে ক্রেতা পণ্যের ত্রুটি দেখে নিতে পারে। তিনি (ﷺ) বললেন, যে প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।[২৫]

[২৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ১০২; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৪৫২।*

আর 'কসম বা শপথ' পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করে বটে; কিন্তু লাভ (বরকত) বিনষ্ট করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী :

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ)، يَقُوْلُ : اَلْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'কসম বা শপথ' পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করে বটে; কিন্তু লাভ (বরকত) বিনষ্ট করে।[২৬]

অপর একটি হাদীসে এ দৃষ্টান্ত এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

رَجُل حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِيْ وَهُوَ كَاذِبٌ.

"এক ব্যক্তি 'আসরের পর তার পণ্য সম্পর্কে কসম খেয়ে বলে, তাকে পণ্যটি এত এত মূল্যে দেওয়া হয়েছে। তার কথা ক্রেতা বিশ্বাস করল, অথচ সে মিথ্যুক"।[২৭]

সুতরাং তাঁরা যদি (ক্রয় বিক্রয়ে) সত্য বলে এবং (পণ্য দ্রবের দোষ গুণ) খুলে বলে, তাহলে তাদের ক্রয় বিক্রয়ে বরকত দেয়া হয়। অন্যথা যদি (পণ্যদ্রব্যের দোষগুণ) গোপন করে এবং মিথ্যা বলে তাহলে, বাহ্যত তাঁরা লাভ করলেও তাদের ক্রয় বিক্রয়ের বরকত বিনাশ করে দেয়া হয়। আর মিথ্যা কসম পণ্য দ্রব্য চালু করে ঠিকই, কিন্তু তা উপার্জনে বরকত থাকে না। পরন্ত মিথ্যা বলে বা মিথ্যা কসম খেয়ে ধোঁকা দিয়ে পণ্য বিক্রয় করা অসদুপায়ে অন্যের মাল হরণ করার শামিল। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজী হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ এবং একে অপরকে হত্যা কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"[২৮] ❑

[২৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ২০৮৭; সহীহ মুসলিম- হা. ১৬০৬; সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৩৩৫।*

[২৭] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৪৭৪, ৩৪৭৫, সহীহ; সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ৪৪৬২, সহীহ।*

[২৮] *সূরা আন্ নিসা : ২৯।*

প্রবন্ধ

সবর যেভাবে করা উচিৎ

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

সবর বা ধৈর্য মূলত মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ একজন মু'মিন বান্দার অন্যতম বৈশিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা যাকে এই গুন দেন, সেই এই গুনে সুসজ্জিত হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমে বহু স্থানে সবর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সবরকে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি। এখন দেখা যাক সবর কি?

সবরের শাব্দিক অর্থ হলো– বাঁধা দেয়া, বিরত রাখা, বেঁধে রাখা। আভিধানিক অর্থ হলো– ইচ্ছার দৃঢ়তা এবং প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ শক্তি যার সাহায্যে কোনো মানুষ তার প্রবৃত্তির চাহিদা ও বাহ্যিক বিপদ-মুসিবতের মোকাবেলায় সৎ পথে দৃঢ় থেকে সামনের দিকে আগ্রসর হতে থাকে।

শরীয়তের ভাষায় অন্তরকে অস্থির হওয়া থেকে, জিহ্বাকে অভিযোগ করা থেকে এবং অংগ প্রত্যংগকে গাল চাপড়ানো বা বুকের কাপড় ছেঁড়া থেকে বিরত থাকাকে সবর বলে। এক কথায় যাবতীয় লোভ লালসা হতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এটা করতে পারলেই সবরকারীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে।

আর মজার ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সূরা আল বাক্বারাহ্'র ১৫৫-১৫৭ নং আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন কিভাবে আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন এবং এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমাদের কি প্রতিফল দিবেন সবই।

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ○ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ○ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾

উক্ত আয়াতের অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি পরীক্ষা করবো তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ ও শস্যের ঘাটতির যে কোনো একটি দ্বারা। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করো। যাদের উপর কোনো বিপদ আসলে তারা বলে– নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এদের উপর তাদের রবের পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই হবে হিদায়াত প্রাপ্ত।"[২৯]

এবার দেখা যাক সবর বা ধৈর্য কিভাবে ধরতে হবে : এ প্রসঙ্গে প্রথমেই দেখি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বয়ং আমাদের প্রিয় রাসূল (ﷺ)-কে ছোট বেলা হতেই এমন অবস্থায় জীবন-যাপন পরিচালনা করিয়েছেন যা আমাদের অন্তরে ধৈর্য ধরার উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছে। যেমন- জীবনে বাবাকে দেখেননি, মায়ের আদরেও বড় হতে পারেনি, আর্থিক অবস্থার জন্য ছোট বেলা হতেই ব্যবসার কাজে নিয়োজিত হতে হয়েছে, যিনি মহান আল্লাহর প্রিয় বন্ধু তিনি মেষ চরিয়েছেন, এভাবে কত কঠিন বাস্তবতাকে সামাল দিয়ে মহান রবের পথে দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে গেছেন।

এ প্রসঙ্গে বুখারী'র ৫৬৪৮, ৫৬৪৭ এবং সহীহ মুসলিম-এর ২৫৭১ নং হাদীসে ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত।

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قَالَ أَجَلْ إِنِّيْ أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلْ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

তিনি বলেন, "আমি নবী (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি গায়ে হাত দিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার যে, প্রচণ্ড জ্বর। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমাদের দু'জনের সমান আমার জ্বর আসে। আমি বললাম, তার জন্যই কি আপনার পুরুষ্কার দ্বিগুন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ব্যাপার তা-ই। অনুরূপ যে মুসলিমকে কোনো কষ্টে পৌঁছে, কাঁটা লাগে অথবা তার চেয়েও কঠিন কষ্ট হয়, আল্লাহ এর কারণে তার পাপসমূহকে মোচন করে দেন এবং তার পাপসমূহকে এভাবে ঝরিয়ে দেওয়া হয়; যেভাবে গাছ তার পাতা ঝড়িয়ে দেয়।"[৩০]

আবার দেখুন : আল্লাহ তা'আলা আইয়্যুব (আলাইহিস সালাম)-কে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তিনি ধৈর্যের উচ্চতম স্তর দেখিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন–

---

* *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।*

[২৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ১৫৫-১৫৭।*

[৩০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৪৮।*

﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾

"আর স্মরণ করো আমার বান্দা আইয়্যূবের কথা, যখন সে তাঁর রবকে ডাকলো এই বলে যে, শয়তান আমাকে কঠিন যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।"[৩১]

সম্ভবত আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম) কোনো কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বাইবেলও এ কথাই বলে যে, তাঁর সারা শরীর ফোড়ায় ভরে গিয়েছিল। এ রোগে আক্রান্ত হবার পর আইয়্যূবের স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেছিল, এমনকি সন্তানরাও তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। রোগের প্রচণ্ডতা, ধন-সম্পদের বিনাশ এবং আত্মীয়-স্বজনদের মুখ ফিরিয়ে নেবার কারণে তিনি যে মানসিক এবং শারিরিক যন্ত্রণার মধ্যে পতিত হয়েছিলেন তার থেকে বড় যন্ত্রণা এবং কষ্ট ছিল যে, শয়তান তার প্ররোচনার মাধ্যমে তাঁকে বিপদ গ্রস্ত করেছে। এ অবস্থায় শয়তান তাকে আল্লাহ তা'আলা থেকে হতাশ করার চেষ্টা করে, অকৃতজ্ঞ করাতে চায়, অধৈর্য হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম) শয়তানের প্ররোচনার ফাঁদে পা দেননি। এমনকি নিজের শারীরিক কষ্টের কোনো অভিযোগ করেননি।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ○ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ﴾

"স্মরণ করো আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম)-এর কথা, সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, আমি রোগগ্রস্ত হয়ে গেছি এবং তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। আমি তার দু'আ কবুল করেছিলাম এবং তাঁর যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম। শুধু তাঁর পরিবার পরিজনই তাঁকে দেয়নি; বরং এই সাথে এ পরিমাণ আরো দিয়েছিলাম নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এ জন্য যে, এটা একটি শিক্ষা হবে 'ইবাদতকারীদের জন্য।"[৩২]

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মহান আল্লাহর কোনো নেক বান্দারা যখন বিপদের ও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হন তখন তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের কাছে কোনো অভিযোগ করেন না; বরং ধৈর্যসহকারে তাঁর চাপিয়ে দেওয়া পরীক্ষাকে মেনে নেন এবং ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য কেবল তাঁরই কাছেই সাহায্য চান। অন্য কারোর দরবারে কখনই সাহায্য চান না। অথচ আমরা কোনো সংকটে পড়লেই অন্যের দরবারে সাহায্য পাওয়ার আশায় ছুটে চলে যাই।

এ জন্যই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সূরা আল হাজ্জ-এর ১১ নং আয়াতে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾

"মানুষের মধ্যে এমন কতক মানুষ রয়েছে, যারা দ্বিধার সাথে মহান আল্লাহর 'ইবাদত করে। যদি তার কোনো কল্যাণ হয় তবে সে খুব খুশী হয়। আর যদি তার কোনো বিপর্যয় ঘটে তাহলে সে তার আসল চেহারায় ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটি হলো সুস্পষ্ট ক্ষতি।"[৩৩]

অবশ্য নেক বান্দারা ভালো করেই জানেন, যা কিছু পাওয়ার মহান আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। তাই বিপদের ধারা যত দীর্ঘ হোক না কেন তারা তাঁরই করুণার প্রার্থী হন। আর এ সবর করলে পুরুষ্কারেও তারা ধন্য হন, যার দৃষ্টান্ত আইয়্যূব (আলাইহিস সালাম)-এর জীবনে দেখা যায়।

সবরের পুরষ্কার সম্পর্কে সহীহুল বুখারী'র ১২৮৩, ১২৫২ নং হাদীসে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র বর্ণিত হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত অন্য কোনো পুরষ্কার নেই, যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়তম কাউকে কেড়ে নিই এবং সে সওয়াবের নিয়তে সবর করে।"[৩৪]

﴿وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

"আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।"[৩৫]

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ (ﷺ)

---

[৩১] *সূরা সাদ : ৪১।*
[৩২] *সূরা আল আম্বিয়া- : ৮৩-৮৪।*
[৩৩] *সূরা আল হাজ্জ : ১১।*
[৩৪] *সহীহুল বুখারী : ১২৮৩, ১২৫২।*
[৩৫] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৩৫।*

فَقَالَتْ إِنِّيْ أُصْرَعُ وَإِنِّيْ أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِيْ قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّيْ أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِيْ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيْ.

‘আত্বা ইবনু আবী রাবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী (ﷺ)-এর নিকটে এসে বলল যে, আমার মৃগ রোগ আছে, আর সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য একটু দু‘আ করুন। তিনি বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে সবর করো; এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি চাও তাহলে আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করবো। স্ত্রী লোকটি বলল, আমি সবর করবো। অতঃপর লোকটি বলল, আমার রোগ উঠার সময় দেহে কোনো কাপড় থাকে না। সুতরাং আপনি মহান আল্লাহর নিকট দু‘আ করুন যেন আমার দেহ থেকে রোগের সময় কাপড় সরে না যায়। ফলে নবী (ﷺ) এ কথা শুনে তার জন্য দু‘আ করলেন।[৩৬]

তবে একটি বিষয় নবী (ﷺ) আমাদেরকে মনে রাখতে বলেছেন যে, হাদীসটি–

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

আবূ সা‘ঈদ সা’দ ইবনু মালিক বর্ণিত। কিছু আনসারী রাসূল (ﷺ)-এর নিকট কিছু চাইলেন। তিনি তাদেরকে দিলেন। পুনরায় তারা দাবী করলো। রাসূল (ﷺ) আবার দিলেন। এমনকি যা কিছু আছে সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তিনি সবই দান করলেন এবং বললেন, আমার কাছে যা ছিল সবই দিয়ে দিলাম। কিন্তু একটি কথা মনে রাখবে, যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্য বা সবর করার চেষ্টা করবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে সবর করার ক্ষমতা দান করবেন। আর কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো দান দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্য বা সবর করা অপেক্ষা উত্তম ও বিস্তর হতে পারে।[৩৭]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! উক্ত গুনটি আমাদের ছোটবেলা হতে অনুশীলন করা প্রয়োজন। অবশ্য পিতা-মাতাকে এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে ভূমিকা রাখতে হবে।

সবর করলে উপকার সম্পর্কে আবূ মূসা আশ‘আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয় অথবা সফর করে, তার জন্য সে সুস্থ্য ও ঘরে থাকতে যেরূপ নেকী অর্জন করতো অনুরূপ নেকী তার ‘আমলনামায় লেখা হয়।[৩৮]

সবর বা ধৈর্য মূলত কষ্ট সাধ্য বিষয় যার জন্য পরিশ্রম অপরিহার্য্য। তাই ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমরা যত বেশি ‘আমল সংগ্রহের জন্য সবর বা ধৈর্যের পরিচয় দিব ততবেশি স্থায়ী জীবনের সফলতার দিকে অগ্রসর হব। অবশ্য মু’মিন বান্দাদের জন্য এটি কঠিন কোনো বিষয় নয়।

পরিশেষে রাসূল (ﷺ)-এর পার্থিব্য জীবনের একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করবো–

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى حَصِيْرٍ قَدْ أَثَّرَ فِيْ جَنْبِهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ لَوِ اتَّخَذْتَ فِرَاشًا أَوْثَرَ مِنْ هَذَا فَقَالَ مَا لِيْ وَلِلدُّنْيَا مَا مَثَلِيْ وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِيْ يَوْمٍ صَائِفٍ.

রাসূল (ﷺ) বলেন, পার্থিব জীবন ঐ পথিকের ন্যায়, যে গ্রীষ্মে রৌদ্রজ্জ্বল তাপদাহের দিনে যাত্রা আরম্ভ করল, অতঃপর দিনের ক্লান্তময় কিছু সময় একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নিলো, ক্ষনিক পরেই তা ত্যাগ করে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করল।[৩৯] ❑

[৩৬] *বুখারী- হা. ৫৬৫২; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২৪০০।*

[৩৭] *বুখারী- হা. ১৪৬৯, ৬৪৭০; সহীহ মুসলিম- হা. ১০৫৩।*

[৩৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৯৯৬; মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৯৬৯৪।*

[৩৯] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৭৪৪।*

যিহার : পরিচয়, কাফফারা এবং এ সংক্রান্ত জরুরি বিধি-বিধান

–আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল★

ইসলামী ফিকহে যিহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। কারণ এর সাথে দাম্পত্য জীবনের হালাল-হারামের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিধান জড়িয়ে আছে। তাছাড়া জাহেলি যুগ থেকে চলে আসা এর অব্যবহারে ব্যাপারে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা জানাটাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিম্নে যিহারের সংজ্ঞা, এর কাফফারা এবং এ সংক্রান্ত জরুরি কিছু বিধান সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে সহজ ভাষায় আলোচনা করা হলো– وبالله التوفيق

যিহার কী?

সম্মানিত ফিকাহবিদগণ যিহার এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه.

"স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে তার কোনো মাহরাম নারীর সাথে সাদৃশ্য দেওয়াকে যিহার বলা হয়।" অথবা تشبيه المنكوحة بمن تحرم عليه "বিবাহিত স্ত্রীকে এমন মহিলার সাথে সাদৃশ্য দেওয়া যে তার জন্য হারাম।"[৪০]

উদাহরণ : কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে যে, তুমি আমার জন্য হারাম যেমন আমার মা আমার জন্য হারাম বা যেমন আমার বোন আমার জন্য হারাম বা এ জাতীয় বাক্য তাহলে এটাকে যিহার বলা হয়। এর বিভিন্ন রূপ আছে এবং সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও কিছু ভিন্নতা আছে– যেগুলো ফিকহের কিতাবসমূহে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। যিহার প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۚ وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' (মায়ের মতো হারাম বলে ঘোষণা করে) করে– তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মা তো কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।"[৪১]

সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য হওয়ার প্রেক্ষাপটে স্বামীর পক্ষ থেকে রাগবশতঃ যিহার সংঘটিত হয়। যেমন- তাফসীরে উল্লেখ করা হয় যে, খাওলা বিনতু সালাবা এবং তার অতিবৃদ্ধ স্বামী আউস ইবনুস সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মাঝে মনোমালিন্য হওয়ার প্রেক্ষাপটে আউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ক্রোধান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي.

"তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো।"

অর্থাৎ- আমার মা যেমন- আমার উপর হারাম তেমনি তুমিও আমার জন্য হারাম। জাহেলি যুগে কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে এভাবে বলতো।

যাহোক ঘটনাটি রাসূল (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাদের মাঝে সমঝোতা করার চেষ্টা করছিলেন ইত্যবসরে তার উপর সূরা আল মুজা-দালাহ্'র জিহার সংক্রান্ত আয়াতসমূহ নাজিল হয়। তারপর রাসূল (ﷺ) তাকে যিহারের কাফফারা প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন।[৪২]

যিহারের বিধান কী?

ইসলামে যিহার একটি অন্যায় আচরণ এবং হারাম কাজ। কেউ এমনটি করলে তার জন্য কাফ্ফারা আদায় করা আবশ্যক। কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হারাম। জাহেলি যুগে যিহার করাকে তালাক হিসেবে গণ্য করা হতো। ফলে চিরস্থায়ীভাবে স্ত্রী মিলন নিষিদ্ধ বলে গণ্য করা হত। যেমন- তাফসীরে কুরতুবীতে এসেছে,

وذلك كان طلاق الرجل امرأته في الجاهلية.

"জাহেলি যুগে এটাই স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে তালাক ছিল।" কিন্তু ইসলাম তা স্থায়ী হারামের পরিবর্তে অস্থায়ী হারামে রূপান্তরিত করেছে। অর্থাৎ- কোনো স্বামী তার স্ত্রীর সাথে যিহার করলে কাফফারা প্রদান করলে তা হালাল হয়ে যাবে।

★ *দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদি আরব।*

[৪০] *শারহু যাদিল মুস্তাকনি- শাইখ মুহাম্মদ মুখতার শানকিতি। শাইখ উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন মাযহাবের আলোকে যিহারের আরও একাধিক সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন।*

[৪১] *সূরা আল মুজা-দালাহ্ : ২।*

[৪২] *তাফসীরে ইবনু কাসির- সংক্ষেপায়িত।*

যিহারের কাফ্ফারা কী?

যিহারের কাফ্ফারা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ﴾

"যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে ফেলে, অতঃপর তাদের বক্তব্য প্রত্যাহার করে, তাদের কাফ্ফারা হলো, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা করো। যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম হয় সে ষাট জন মিসকিনকে আহার করাবে। এটা এজন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফিরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৪৩]

অর্থাৎ- যিহারের কাফ্ফারা রামাযান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাসের কাফ্ফারার অনুরূপ। তা হলো–

১. একটি মু'মিন দাস মুক্ত করা। কিন্তু বর্তমান যুগে দাস-দাসী প্রথা প্রচলিত না থাকার কারণে তা প্রযোজ্য নয়।

২. এটি সম্ভব না হলে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা থাকা। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের হায়েয বা নেফাস শুরু হলে সে দিনগুলোতে রোযা থেকে বিরত থাকবে। অনুরূপভাবে ঈদ উপলক্ষে রোযা রাখা নিষিদ্ধ দিনগুলোতে রোযা রাখা থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র হলে এবং ঈদে রোযা রাখা নিষিদ্ধ দিনগুলো অতিবাহিত হলে যথারীতি রোযা রাখা শুরু করবে।

৩. তাও সম্ভব না হলে ৬০ জন মিসকিন (দরিদ্র-অসহায় মানুষ)-কে এক বেলা খাবার খাওয়ানো অথবা খাদ্য দ্রব্য দান করা। খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ, প্রত্যেক দেশের প্রধান খাদ্যদ্রব্য (যেমন- আমাদের দেশে চাল) থেকে প্রায় সোয়া কেজি। এর সমপরিমাণ টাকা দেওয়া শরীয়াতসম্মত নয়। কারণ কুরআনে খাদ্যদ্রব্যের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর ব্যতিক্রম করা বৈধ নয়।

স্ত্রীর পক্ষ থেকে কি স্বামীর সাথে যিহার হয়?

পূর্বোক্ত আয়াতের আলোকে অধিকাংশ আলেম বলেন, যিহার কেবল স্বামীর পক্ষ থেকে হয়; স্ত্রীর পক্ষ থেকে নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে কেবল স্বামীদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

অতএব কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীকে এভাবে বলে যে, "তুমি আমার জন্য হারাম যেমন আমার জন্য আমার পিতা হারাম অথবা যেমন আমার ভাই আমার জন্য হারাম", তাহলে অধিক বিশুদ্ধ মতে তা 'যিহার' বলে গণ্য হবে না; বরং তা হালালকে হারাম করার অন্তর্ভুক্ত। এটিও হারাম ও গুনাহের কাজ।

এটি কসম হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে তার করণীয় হলো, কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করা।

শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ)-কে প্রশ্ন করা হয়, কোনো হতভাগা স্বামী স্ত্রীকে 'তুই আমার মা বা মায়ের মতো' বললে 'যিহার' হয়। কিন্তু যদি কোনো হতভাগী স্ত্রী 'তুমি আমার পিতা বা পিতার মতো' বলে। তাহলে তার বিধান কি?

তিনি উত্তরে বলেন, "এ ক্ষেত্রে মহিলার পক্ষ থেকে যিহার হবে না। কেবল মহিলাকে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।"[৪৪]

শাইখ আল্লামা মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) ও অনুরূপ কথা বলেছেন।

কসম ভঙ্গের কাফফারা : ✓ দশজন মিসকিনকে মধ্যম ধরণের খাবার খাওয়ানো (টাকা দেওয়া শরীয়াত সম্মত নয়)। ✓ অথবা ১০জন মিসকিন (দরিদ্র-অসহায় মানুষকে) পোশাক দেয়া। ✓ অথবা একটি দাস মুক্ত করা। ✓ এ তিনটির কোনোটি সম্ভব না হলে (লাগাতার) তিনটি রোযা রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِن يُّؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهٗ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوْا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾

[৪৩] *সূরা আল মুজা-দালাহ্ : ৩ ও ৪।*

[৪৪] *দ্বীনী প্রশ্নোত্তর- শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী, বিবাহ ও দাম্পত্য।*

"আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাঁধ। অতএব, এর কাফ্ফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণির খাদ্য যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাকো। অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটা কাফ্ফরা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা করো এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো।"[৪৫]

সুতরাং কেউ যদি আর্থিক সংকটের কারণে উপরোক্ত তিনটি জিনিসের কোনোটি দ্বারা কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করতে সক্ষম না হয় তাহলে লাগাতার তিনটি রোযা রাখবে।

কোনো স্বামী যদি সাধারণভাবে তার স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম ঘোষণা করে তাহলে তার বিধান কী?

কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তার কোনো মাহরাম নারীর সাথে সাদৃশ্য না দিয়ে সাধারণভাবে হারাম ঘোষণা করে। যেমন- সে বলল, "তুমি আমার জন্য হারাম।" অথবা স্ত্রীকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলল, তুমি যদি এ কাজ করো তাহলে তুমি আমার জন্য হারাম বা এ জাতীয় বাক্য তাহলে তা যিহার বলে গণ্য হবে না।

এটিও ইসলামে হারাম। কারণ তা মহান আল্লাহর হালালকৃত বিধানকে হারাম করার শামিল। এটিও কসম হিসেবে গণ্য হবে এবং এ ক্ষেত্রেও কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾

"হে নবী! আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক।"[৪৬]

[৪৫] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৮৯।*
[৪৬] *সূরা আত্ তাহরীম : ১ ও ২।*

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا.

"যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তার জন্য হারাম করে দেয় তাহলে তা হলো, একটি কসম। যার জন্য কাফ্ফারা আদায় করবে।"[৪৭]

উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর হালালকৃত কোনো খাবার, পানীয়, পোশাক বা অন্য যে কোনো কিছুকে নিজের জন্য হারাম বলে ঘোষণা দেয় তাহলে তার উপর একই বিধান বর্তাবে। অর্থাৎ- তার জন্য কসম ভঙ্গের কাফ্ফারারা আদায় করা আবশ্যক।

তবে কেউ যদি উক্ত বাক্য বলার মাধ্যমে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়ত করে তাহলে তালাক বলে গণ্য হবে। কারণ "নিয়তের উপর সকল কর্ম নির্ভরশীল।"[৪৮]

কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বা কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে তার কোনো মাহরামের সাথে বা তার বিশেষ কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করে তাহলে তার বিধান কী?

কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীর শারীরিক গঠন, সৌন্দর্য বা গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বলে যে, তোমার চোখ দেখতে আমার মায়ের মতো, তোমার চেহারা আমার বোনের মতো ইত্যাদি অথবা কোনো মহিলা তার স্বামীকে বলে, তোমার দেহের গঠন আমার ভাই বা পিতার মতো তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। অনুরূপভাবে সম্মান-মর্যাদার ক্ষেত্রে বা বৈশিষ্টগতভাবে তুমি আমার মা/বাবার অনুরূপ তাহলেও তা যিহারের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ- হারাম করার নিয়ত না থাকলে যিহার বলে গণ্য হবে না।[৪৯]

قال ابن قدامة : وإن نوى به الكرامة والتوقير، أو أنها مثلها في الكبر، أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله في نيته.

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন করে সে আলোকে জীবন যাপনের তাওফীক্ব দান করুন –আমিন। –আল্লাহু আ'লাম। ❑

[৪৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯১১ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১৪৭৩।*
[৪৮] *সহীহুল বুখারী।*
[৪৯] *আল মুগনি- ইবনু কুদামা।*

রাসূল (ﷺ)-এর শাসনব্যবস্থা

মূল : ড. হাফিয আহমাদ আজাজ আল কারামি

ভাষান্তর : তানযীল আহমাদ*

[চতুর্থ পর্ব]

ইতিহাসের বর্ণনাগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, তৎকালীন সময়ে মক্কা একটি মুক্তি মুদ্রা বাজার হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুদ্রা লেনদেনকারীরা অর্থনীতিকে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। পণ্য ও মুদ্রা বিনিময় ছিল প্রধান কাজ। তারা ব্যবসায়ীদেরকে ধার-কর্জও প্রদান করত। আবার কখনো নিজের কাছে অর্থ না থাকলে ব্যবসায়ীদের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করত। মুবারারদ (মৃত্যু : ২৮৫ হিজরি) বলেন, মুদ্রা লেনদেনকারীদের একজন হঠাৎ করে নিঃস্ব হয়ে গেলে তার পাওনাদাররা তাকে ধরে বসল। তখন তিনি তার প্রতিবেশীদেরকে অনুরোধ করলেন যেন তারা কুরাইশের অমুক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট গিয়ে তার জন্য সুপারিশ করে, তারা তাই করল।[৫০]

এতে প্রমাণিত হয় যে, মুদ্রা লেনদেনকারীরা সম্পদ দিয়ে কেনা-বেচা করত। অর্থাৎ- তারা ছিল লেনদেনের প্রধান কেন্দ্র।

অবশিষ্ট রইল ট্যাক্স ব্যবস্থাপনার বিষয়টি; যা মক্কার স্থানীয় প্রশাসন বহিরাগতদের জন্য আরোপ করেছিল, অর্থাৎ- জাহেলি যুগে কুরাইশ গোত্র মক্কায় আগত লোকদের উপর নির্দিষ্ট কর আরোপ করেছিল। যা তাদের ভাষায় ছিল 'কুরাইশের হক্ব'।[৫১]

এই হক্ব হিসাবে তারা আগুন্তক ব্যক্তিটির কাপড় কিংবা জবাইকৃত উটের কিছু অংশ রেখে দিত।

বাজারে শুল্ক ব্যবস্থাপনা (উশর) কার্যকর ছিল। প্রত্যেক বাজারের জন্য পৃথক পৃথক শুল্ক নির্ধারিত ছিল। বাজার ব্যবস্থাপক বা যে গোত্রের জমিতে বাজার ছিল তাদের নিকট তা প্রদান করতে হতো।[৫২] এ জন্য (আজকের দিনের মতো) গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গরা বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা করতে পিছপা হতো না। কারণ হাটের দিনগুলোতে তারাই সেই ট্যাক্স আদায় করত।[৫৩]

পণ্য থেকে আদায়কৃত শুল্কের একটা নির্দিষ্ট অংশ সম্ভবত কাবার রক্ষণাবেক্ষণ, পানি সংগ্রহ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যয় করা হতো।[৫৪]

আমরা আরো এ কথা কল্পনা করতে পারি যে, তৎকালীন মক্কায় কিভাবে বিভিন্ন চুক্তি-সন্ধি, বিশেষত বাণিজ্যিক চুক্তি-পত্র সংরক্ষণ ও কার্যকর করা হতো।

অন্যদিকে মক্কার স্থানীয় ও বাণিজ্যিক নিরাপত্তার জন্য সামরিক ব্যবস্থাপনা ছিল খুবই জরুরি। ইতিহাসের বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হারামের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে ছিল قريش الظواهر বা মক্কার উপকণ্ঠে বসবাসরত কুরাইশরা। যেহেতু তারা ছিল বেশ শক্তিশালী ও যুদ্ধ প্রিয়। তাদেরকে المناسر -অগ্রগামী নামে ডাকা হতো।[৫৫]

পক্ষান্তরে قريش البطاح বা হারামের পাশে বসবাসকারী কুরাইশরা ছিল ধনাঢ্য ও নেতৃত্বস্থানীয়। তাদেরকে বলা হতো الضب, কারণ তারা হারাম শরীফকে আবশ্যক করে নিয়েছিল।[৫৬]

মক্কার প্রতিরক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের জোটকে বলা হতো احابيش (আহাবিশ)। তারা এবং মক্কাবাসীরা এই চুক্তিতে জোটবদ্ধ হয়েছিল যে, আমরা মহান আল্লাহর নামে শপথ করছি যে, শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বদাই আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব। কোনো স্বেচ্ছাসেবী দায়িত্ব পালনে অবহেলা করবে না।[৫৭]

মক্কাবাসীরাও দেখল যে, আহাবিশরা অনেক শক্তিশালী, মক্কার প্রতিরক্ষায় তারা দারুণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। ফলে তারা তাদের সাথে চুক্তি করল। এক আহাবিশ কবি বলেন,

'আম্‌র এবং আব্দে মানাফ করেছে একটি চুক্তি, (আমরা অনেক আশাবাদী), যোগাবে তা শক্তি।[৫৮]

---

* *শিক্ষক : মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ-মিরপুর; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।*

[৫০] *আল কামিল- মুবারবাদ, পৃ. ৪৫৯।*

[৫১] *আল ইলতিকাক- ইবনু দুরাইদ, পৃ. ২৮২।*

[৫২] *আল লিসান- ইবনু মানযুর, ৪/৫৬৮।*

[৫৩] *মু'জামুল বুলদান- ইয়াকুত হামাবী, ৪/১৪২।*

[৫৪] *আল মুফাযযাল- জাওয়াদ আলী, ৭/৪৮০।*

[৫৫] *المناسر অর্থ হলো– সৈন্য বাহিনীর অগ্রভাগে যারা থাকে। আনসাব-বালাযুরি, ১/৩৯-৪০; আল কামিল- ইবনুল আসীর, ২/১৩।*

[৫৬] *আল কামিল- ১/৪০।*

[৫৭] *আহাবিশরা হলো– বানু মুস্তালিক, বানু হায়া ইবনু সা'দ ইবনে 'আম্‌র এবং বানু হারেস ইবনু খুযাইমাহ্। মক্কার নিম্নভূমিতে অবস্থিত হাবশী পাহাড়ের পাদদেশে একত্রিত হয়ে তারা উক্ত চুক্তি করে ছিল বলে তাদেরকে আহাবিশ বলা হয়। অথবা একত্রিত হওয়াকেই মূলত আহাবিশ বলা হয়। কারণ আরবিতে تحابش অর্থ হলো একত্রিত হওয়া। আল উমদাহ ফি মাহাসিনিল শের- ইবনু রশীক আল কাইরোয়ানী, ৩/১৯৩ ; আল লিসান- ৬/৩৭৮।*

[৫৮] *আল মুহাব্বার- ইবনু হাবীব, ৩৪১ পৃ.; আল আনসার-বালাযুরি, ১/৫৩, ৭৯।*

ইয়াকুবি (মৃ. ২১২ হি.) এই চুক্তির বিবরণ দিয়ে বলেন, আহাবিশের এই চুক্তিটি কাবা ঘরের রুকনে ইয়ামানীর নিকটে সম্পাদিত হতো। একজন কুরাইশী আর একজন আহাবিশের গোত্রের লোক সেই রুকনে হাত রেখে মহান আল্লাহর নামে এবং বাইতুল্লাহ, মাকামে ইব্রাহীম, ঐ রুকন ও পবিত্র মায়ের সম্মানের কসম করে বলত যে, চিরদিন তারা সৃষ্টিজীবের সাহায্যে পরস্পর এগিয়ে আসবে, পিছপা হবে না। এ জন্যই তাদেরকে আহাবিশ বলা হয়।[৫৯]

যুদ্ধকালীন সময়ে ধনী ব্যক্তিরা গরীবদেরকে সম্পদ ও অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করত। যেমন- 'আব্দুল্লাহ ইবনু কাদআন ফুজ্জার যুদ্ধের সময় তার গোত্র 'বানু তাইম'কে সম্পদ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে একশজন লোককে পূর্ণ অস্ত্র দিয়েছিলেন। এটা ছিল শাআতা'র দিন। এছাড়াও তিনি আহাবিশকে অস্ত্র দিয়েছিলেন। তেমনি একশ'জনকে একশটি উট দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, এক হাজারটি। এটা ছিল পানি পানের দিন।[৬০]

কাজেই এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ধনীরা যুদ্ধের জন্য গরীবদের সাহায্য করত।

মক্কার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বাভাবিক সময়েও বিভিন্ন দায়িত্ব ও পদের সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন- القبة والأعنة।[৬১]

এই দায়িত্বটি ন্যস্ত ছিল বানু মাখযুমের ওপর। তারই ধারাবাহিকতায় দায়িত্ব লাভ করেন খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (মৃ. ২১ হি.)। তেমনি 'আব্দুল্লাহ ইবনু জাদআনের নিকট অস্ত্র জমা থাকত। তিনি ছিলেন অস্ত্রাগার। প্রয়োজনের সময় তিনি যোদ্ধাদের মাঝে সেগুলো বন্টন করে দিতেন।[৬২]

সামরিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে সকল দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল القيادة -আল কিয়াদা (নেতৃত্ব) ও اللواء -লিওয়া (পতাকা বহন) ছিল অন্যতম। এই দায়িত্ব পালন করত বানু 'উমাইয়াহ্। তাদের পক্ষে আবূ সুফিয়ান ইবনু হারব (মৃ. ২২ হি.) ইসলাম আসার পূর্বকাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করতেন।[৬৩]

মক্কার যুদ্ধ-পতাকাকে বলা হতো العقاب -আল উকাব।[৬৪]

সামরিক সংগঠনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল মক্কার নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের স্ব-স্ব গোত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাদেরকে যুদ্ধমুখী করুক। এ কারণেই প্রত্যেক গোত্রের গোত্রপতিগণ যুদ্ধ-সম্পর্কিত যে নির্দেশনা দিতেন তাই পালন করত গোত্রের লোকেরা।[৬৫]

আর যুদ্ধের মূল নেতৃত্ব এবং যোদ্ধাদের মাঝে যোগাযোগ ও সেতুবন্ধন তৈরির দায়িত্ব ছিল কুরাইশ প্রবীনের।[৬৬]

তিনিই যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্ব দিতেন এবং বৃহত্তর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্যান্য গোত্রগুলোর নেতৃত্বও প্রদান করতেন।

কূটনৈতিক সম্পর্ক (Diplomatic Correr Pondence) : মক্কার বাইরের অঞ্চলগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সেকালে মক্কায় অল্প-বিস্তর কূটনৈতিক বিভাগও বিদ্যমান ছিল। কূটনৈতিক বা দূত হিসাবে বানু আদী'র লোকেরা দায়িত্ব পালন করত। এই বিভাগকে বলা হতো السفارة বা এম্বেসি। মক্কাবাসী 'উমার ইবনু খাত্তাবকে (মৃ. ২৩ হি.) এই দায়িত্বভার অর্পন করেছিল। যুদ্ধকালীন ও স্বাভাবিক উভয় অবস্থায় তিনি দূতিয়ালীর কাজ করতেন। তবে এই দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হওয়া ছিল আবশ্যক। তেমনি বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্র সম্পর্কে বিশদ জানাশোনা এবং তাদের রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও পরিস্থিতি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকতে হতো। মক্কাবাসী 'উমারকে আক্রমণের মুহূর্তে কিংবা প্রতিহতের মুহূর্তে উভয় অবস্থায় দূত হিসাবে প্রেরণ করত এবং তার উপর আস্থাশীল ছিল।[৬৭]

প্রাক-ইসলামী যুগে মক্কায় পত্রের প্রচলন ছিল মর্মে ইশারা পাওয়া যায়। ওরাকা ইবনু নাওফালের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয় এমন একটি কবিতায় এমনটিই ফুটে উঠেছে। ইবনু জাফনা আল গাসসানীর বাড়ীতে যখন 'উসমান ইবনু আল হুআইরিসকে হত্যা করা হয় তখন ইবনু জাফনাকে অভিযুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, 'উসমান ছিলেন পত্র বাহক। এই প্রেক্ষিতে ওরাকা বলেছিলেন, আর সে নিজের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে পত্র বহন করেছে, এমন জায়গায় যেখানে মৃত্যুর সমূহ সম্ভাবনা ছিল।[৬৮]

সেকালের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, প্রাক-ইসলামী যুগেও বিভিন্ন চুক্তি,

---

[৫৯] *তারিখে ইয়াকুবি- ১/২১২।*
[৬০] *আল বাদউ ওয়াত তারিখ- আল মাকদিসি, ৪/১৩৪; আল কামিল- ১/৩৫৯-৩৬১ ও অন্যান্য।*
[৬১] *আল ইকদুল ফারীদ- ইবনু আব্দি রব্বিহি, ২/২২৬; উসদুল গবহি- ইবনুল আসীর, ২/৯৩।*
[৬২] *আইয়ামুল আরব- ৩২৯ পৃ.।*
[৬৩] *আল মুহাব্বার- ১৪৬, ১৬৫।*
[৬৪] *আল ইকদুল ফারাদ- ৩/৪৩৬।*
[৬৫] *আখবারে মক্কা- আযরাকী, ১/৬৩-৬৬।*
[৬৬] *আল মুফাযযাল- জাওয়াদ আলী, ৫/২৫০।*
[৬৭] *তারিখে 'উমার- ইবনুল জাওযী, ২২ পৃ.।*
[৬৮] *নাসাবু কুরাইশ- মুসআব যুবাইরি, ২১০ পৃ.।*

পারস্পরিক সন্ধি ও আঞ্চলিক সম্পর্ক প্রচলিত ছিল। ইলাফ বা বাণিজ্যিক চুক্তিই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ঐ সময়ে মক্কা নগরী তার পূর্ব-পশ্চিম উভয়দিকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভারসাম্যতা রক্ষা করতে আপন যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিল। কারণ একই সাথে তারা তৎকালীন রোম-পারস্যের সাথে সমানতালে সম্পর্ক রেখে চলছিল এবং বৃহৎ এই দুই সাম্রাজ্যের বিবাদের সুযোগে মক্কা নগরী ফায়দা লুটতে সক্ষম হয়েছিল।[৬৯]

যদিও রোম কয়েকবার মক্কায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারেই ব্যর্থ হয়েছে। মক্কাবাসীরা তাদের ইলাফ নামক বাণিজ্যিক চুক্তির সাহায্যে বহিঃরাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছিল এবং মালা পর্ষদের নেতৃত্বাধীন তাদের স্থানীয় গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রাখতে পেরেছিল।

বিচার ব্যবস্থা : মক্কার বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিহাসের বর্ণনা হলো– যেখানে বিচার কার্যক্রম প্রচলিত ছিল। 'আমের ইবনু যারব বাজারগুলোতে এবং বিভিন্ন উপলক্ষ্য কেন্দ্র করে বসতেন, বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা তার কাছে আসত আর তিনি তাদের মাঝে বিচার করতেন।[৭০]

উল্লেখ্য, 'আমেরের পর বিচার-কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে তামীম গোত্র।[৭১]

এজন্য তামীম গোত্রের কবিরা গর্ব করত। কারণ তারা তাদের উপর অর্পিত এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি বেশ সুচারুরূপেই আঞ্জাম দিতে পেরেছিল। ফারাযদাক (মৃ. ১১৪ হি.) বলেন, আর আমার চাচা, যাকে মা'দ বিচার-কার্যের জন্য নির্বাচিত করেছিল, যেহেতু তারা উকাযে (বাজার মেলা/উৎসবস্থল) পূর্ণ করত তাদের ওয়াদা, তিনি হলেন আকরা, যিনি অটুট এই সম্মানকে দৃঢ়তার সাথে জড়িয়ে ধরেছিলেন, কখনো তা বিচ্ছিন্ন হতে দেননি।[৭২]

ইবনু হাবীব (মৃ. ২৪৫ হি.) তামীম গোত্রের বিচারপতিদের নামের প্রতিও ইশারা করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, তাদের সর্বশেষ বিচারক ছিলেন সুফিয়ান ইবনু মুজাশিঈ। ইসলামের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত উকাযের সময় তার নিকটে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করা হতো।[৭৩]

রক্তপণ ও জরিমানা গ্রহণ ব্যবস্থা : বিচার-কার্যের সাথে আরো একটি বিষয় সেকালে সম্পর্কযুক্ত ছিল। তা হলো– الأشناق। -আশনাক বা রক্তপণ ও জরিমানা আদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করতেন আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (মৃ. ১৩ হি.)। তিনিও তামীম গোত্রের ছিলেন। তিনি কারো পক্ষ থেকে কোনো জরিমানা প্রদান করলে কুরাইশরা পরে তাকে তা পরিশোধ করে দিত।[৭৪]

এই দায়িত্ব এককভাবে কেবল আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। অন্য কেউ এই দায়িত্ব পালন করলেও তাকে পরিশোধ করা হতো না।[৭৫]

এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, আপনাকে বা জরিমানা আদায়ের উল্লিখিত দায়িত্বটি কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদিও মাঝে মাঝে অন্য ব্যক্তিও সেই কাজ করে দিত।

এই ছিল প্রাক-ইসলামী যুগে মক্কার শাসন ব্যবস্থার চিত্র। যা মূলত মক্কার গোত্রীয় শাসন পদ্ধতির পূর্ণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। এভাবেই জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা ক্রমান্বয়ে উন্নতি ও বিকাশ লাভ করেছিল এবং ইসলামের পূর্ব পর্যন্ত উল্লিখিত ব্যবস্থার যেন কোনো ব্যত্যয় না হয় সেদিকে নেতৃবৃন্দের সজাগ দৃষ্টিও ছিল। নবী (ﷺ) এসে কাবা ঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলী ব্যতীত অন্যান্য দায়িত্ব ও শাসন পদ্ধতির বিলোপ করেন। যেহেতু ঐ দায়িত্বটি জনগণের আবশ্যকীয় ছিল। তদুপরি, সেগুলোর গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পায়। বিশেষ করে এই দায়িত্ব কেবল হজ্জের মৌসুমের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।

ইয়াসরিবের শাসনব্যবস্থা[৭৬] **:** ইয়াসরিবের প্রথম অধিবাসী কারা এ সম্পর্কে ইতিহাসের রিওয়ায়াতগুলোর ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে উল্লেখ আছে যে, ইয়াসরিবের প্রথম অধিবাসী হলো আমালেকা। অতঃপর ইয়াহূদীরা তাদের উপর বিজয়ী হয়।[৭৭]

---

[৬৯] *আল ইলাফ আল কুরাশি- ইব্রাহীম বাইদুন, পত্রিকা, তারিখুল আরব ওয়াল আলাম, সংখ্যা : ৪৩/১৯৮২, পৃ. ২৯।*

[৭০] *আল মুহাব্বার- ইবনু হাবীব, ১৮১-১৮২ পৃ.।*

[৭১] *আল মুহাব্বার- পৃ. ১৮১।*

[৭২] *শরহু দিওয়ানে ফারাযদাক- ২/৪৩০।*

[৭৩] *আল মুহাব্বার- পৃ. ১৮২।*

[৭৪] *ইকদুল ফারীদ- ৩/২৩৬।*

[৭৫] *ইকদুল ফারীদ- ৩/২৩৬।*

[৭৬] *ইয়াসরিব মদীনার পূর্ব নাম। এই নামকরণের কারণ হলো– সেখানে ইয়াসরিব ইবনু ফানিয়া ইবনে মুহালহিল ইবনুল আযাম প্রথম বসবাস শুরু করেন। সামহুদী এর আরো অনেক নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন- তাইবাহ, রাকীয়া, মুবারাকা ও অন্যান্য। দেখুন : মুখতাসার- ইবনুল ফাকীহ, পৃ. ২৩; মু'জামুল বুলদান- ইয়াকুত হামাবী, ৫/৪৩০; ওফাউল ওফা...- সামহুদী, ১/৭-১৯।*

[৭৭] *আল আগানী- আল আসফাহানী, ১৯/৯৪; তারিখ- ইবনু খালদুন, ২/২৮৬।*

ইয়ামানের বিখ্যাত বন্যার পর আরব বংশোদ্ভূত আউস ও খাযরায ইয়াসরিবে আগমন করে ইয়াহূদীদের পাশে বসবাস শুরু করে।[৭৮]

তবে ইয়াসরিবের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে খুব কমই জানা যায় এবং যা জানা যায় যেগুলোর অনেকাংশ বিরোধপূর্ণ। অথচ মক্কার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ও তথ্য উপস্থিত। ফলে আমরা ইয়াসরিব সম্পর্কে খুব কমই জানতে পারি। তবুও প্রাক-ইসলামী যুগে ইয়াসরিবের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা একটি প্রাথমিক ধারনা দিতে পারব বলে আশাবাদী।

ইয়াসরিবের নগর ব্যবস্থাপনার মূল চাবিকাঠি ছিল মূলত ইয়াহূদীদের হাতে। কারণ তারা সেখানে আগমনের পরেই ক্ষেত-খামার ও বাগান চাষ আরম্ভ করে।[৭৯]

আর ইয়াহূদীরা তাদের ধর্মীয় রাহেব বা পণ্ডিতদের প্রতি ছিল অনুগত। অর্থাৎ- বলা চলে, ধর্মীয় আলেমগণই শাসনব্যবস্থার দণ্ডমুন্ড ছিল। তাদের কাছেই ইয়াহূদীরা তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, বিচার-ফয়সালা গ্রহণ করত।[৮০] পবিত্র কুরআনও এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে,

﴿اَتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ﴾

“তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পাদ্রী-পণ্ডিতদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে।”[৮১]

প্রকাশ থাকে যে, এই ইয়াহূদী আলেমরা তাদের সমাজে বিয়ে-শাদী, তালাক, লেনদেন, বিচার-ফয়সালা ও অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য মাল কামাই করত এবং জনগণকে এক প্রকার যিম্মি করে রাখত। আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ﴾

“হে মু’মিনগণ! অধিকাংশ আহবার এবং রুহবান (ইয়াহূদ ও খ্রিষ্টানদের আলেম ও ধর্ম যাজক) মানুষের ধন-সম্পদ শরীয়াত বিরুদ্ধ উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে, আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।”[৮২]

বরং এ কথা বললে অতিরঞ্জন হবে না যে, ইয়াহূদীদের সেই শাসনব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ধর্ম নির্ভর। যা তাদের আলেমগণ পরিচালনা করত।

অন্যদিকে, যে সকল আরব ইয়াহূদীদের পাশে বসবাসরত ছিল তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল এমন যে, তারা মদীনার কৃষি অঞ্চলকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। অতঃপর প্রত্যেকটি ভাগ একেকটি উপশাখার কর্তৃত্বে ছিল। আবার এই উপশাখাগুলো একটি বড় গোত্রীয় শাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এগুলোর নেতৃত্ব দিতেন একেকজন গোত্রপ্রধান। এমনটিই উল্লেখ করেছেন সামহুদী (মৃ. ১০১১ হি.) তার কিতাবে।[৮৩]

সে সময়ে বৃহত্তর ইয়াসরিবে বিভিন্ন শাখা গোত্রগুলোর মাঝে সহাবস্থান ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় যখনই কোনো বড় গোত্র ছোট ছোট গোত্রগুলোর উপর আক্রমণ করতে চায় তখনই সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই হামলা প্রতিরোধ করে। ছোট ছোট গোত্রীয় ব্যবস্থাপনা থাকায় সকল জনগণকে নিয়ে একই নেতৃত্বের অধীন করা সম্ভব হয়নি। কারণ ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর কোথাও এ কথা নেই যে, ইয়াসরিবের অধিবাসীরা এক নেতার অনুগত ছিল এবং এই অমান্যতা ও নেতৃত্বের প্রতিযোগিতার ফলেই আউয ও খাযরাযের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বিবাদ ও যুদ্ধ চলমান ছিল। ইয়াসরিবের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল শূণ্য। আর সম্ভবত এই বিবাদের পিছনে ইয়াহূদীদের উস্কানী অনেক বড় প্রভাবক ছিল।

তবে জাহেলি যুগের শেষ দিকে ইয়াসরিববাসী একজন নেতার অধীনে আসতে একমত হয়। তারা পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় যে, এক বছর আউসের একজন নেতৃত্ব দিবেন। পরের বছর দিবেন খাযরাযের একজন। সে লক্ষ্যে প্রথম বছর তারা আউস গোত্রের ‘আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুলকে (মৃ. ৯ হি.) তাদের রাজা হিসাবে মনোনীত করে।[৮৪]

“উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক রিওয়ায়াতগুলোতে এ কথার উল্লেখ নেই যে, ইয়াসরিবে মক্কার মতো “মালা পর্ষদ” বা দারুণ নাদওয়ার মতো কোনো পরামর্শ, কক্ষ বা পার্লামেন্ট ছিল। তবে হ্যাঁ, কোনো কোনো রিওয়ায়াতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, সকল শাখা গোত্রগুলোর নেতৃবৃন্দ একটি স্থানে একত্রিত হতো, যা السقيفة -সাকীফা নামে পরিচিত ছিল।[৮৫]

ইয়াসরিবের অর্থব্যবস্থা : ইয়াসরিবের ভূমি উর্বর হওয়ায় ইয়াহূদীরা এখানে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। তারা

---

[৭৮] *আল কামিল- ইবনুল আসির, ১/৬৫৫, ৬৫৮।*
[৭৯] *আল আ’লাক- ইবনু রিসতা, পৃ. ৬৩; আল কামিল- ১/৬৫৫।*
[৮০] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৫৫০।*
[৮১] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩১।*
[৮২] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৩৪।*
[৮৩] *ওফাউল ওফা- ১/১৩৪-১৩৫।*
[৮৪] *আল মুহাব্বার- পৃ. ২৩৩।*
[৮৫] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৫৮৪, ৫৮৫।*

এখানে অনেক দেয়াল বেষ্টিত বাগান সৃষ্টি করে এবং পানির জন্য কূপ ও নালা খনন করে।[৮৬]

এজন্যই ইয়াসরিবের এবং তার আশেপাশে প্রচুর খেজুর বাগানের অস্তিত্ব মেলে। এও লক্ষণীয় যে, ইয়াহূদী এবং আরবরা খেজুর চাষে অনেক সফল হয়। তারা সারিবদ্ধভাবে খেজুর গাছের চারা রোপন করত। এমনকি বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রগুলো নিজ নিজ অধিকৃত উপত্যকাসমূহে সারিবদ্ধ ও সাজানো গোছানো করে খেজুর গাছের বাগান তৈরি করত। একেকটি উপত্যকায় কয়েকটি করে বাগান থাকত। আবার বাগানগুলোতে কয়েকটি করে নালা বা সেচ-খাল থাকত।[৮৭]

উর্বর ভূমি এবং সেই সাথে পানির প্রতুলতা ইয়াসরিবে হরেক রকমের চাষাবাদে সহায়ক ছিল। তবে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ছিল খেজুর। এর উপরেই ইয়াসরিববাসী তাদের খাবার ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল ছিল।[৮৮]

খেজুর চাষে বিশেষ দক্ষতার কারণে ইয়াসরিববাসী গর্ব করত। আমরা দেখি যে, খন্দক যুদ্ধের সময় কাব ইবনু মালিক (মৃ. ৫০ হি.) মক্কাবাসীর উপরে গর্ব করে বলেছিল যে, তার কৃওম বাগানের মধ্যে খেজুর চাষ করে, যে বাগানে এমন কূপ থেকে পানি সিঞ্চন করা হয় যেগুলো আদ জাতির সময় খনন করা হয়েছিল। আর তাদের এমন শস্য রয়েছে যার আকর্ষণীয় শীষ নিয়ে গর্ব করা যায়।[৮৯]

এ সকল কূপ খনন করতো বাগানের মালিকরা। কারণ এই কূপ থেকেই তাদের বাগানে পানি দিতে হতো। কখনো কখনো এ সকল কূপ নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে ভাড়াও দেয়া হতো।[৯০]

কৃষি খাতে ইয়াহূদীদের অবদান অনস্বীকার্য। তারা বিভিন্ন জাতের গাছ লাগাত এবং চাষাবাদের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির আবিস্কার করতো।[৯১]

শিল্প : শিল্পেও ইয়াহূদীরা ছিল বেশ প্রসিদ্ধ। বানু কাইনুকার ইয়াহূদীরা স্বর্ণের অলংকার তৈরিতে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এছাড়াও কৃষি সংশ্লিষ্ট অনেক শিল্প গড়ে উঠেছিল ইয়াসরিবে।[৯২]

তেমনি লোহা দিয়ে অস্ত্র তৈরি শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদিও প্রসিদ্ধ ছিল।

অস্ত্র শিল্পে ইয়াহূদী ও আরব উভয়েই সিদ্ধ ছিল।[৯৩]

মহিলারা ঘরে বসেই পোশাক বুনন করত। সেলাই বা চামড়া প্রক্রিয়াজাত শিল্পও লোকেরা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করত। অনেকেই ছিল যারা গৃহ নির্মাণে অভিজ্ঞ। আবার কুটির শিল্পও তৎকালীন ইয়াসরিবে প্রসিদ্ধ ছিল। তারা তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য এসব শিল্প বেশ ভালোভাবে আঞ্জাম দিতে পারত।[৯৪]

বাণিজ্যিক কারবারে ইয়াসরিববাসী মক্কাবাসীর মতো প্রসিদ্ধ না হলেও মাঝে মধ্যে তারা শাম ও হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে বের হতো।[৯৫]

ইয়াসরিবের বাজার নিয়ন্ত্রণ ছিল মূলত ইয়াহূদীদের হাতে। তারাই প্রয়োজনীয় সকল পণ্য অন্য এলাকা থেকে আমদানী করে কিংবা নিজেরাই উৎপাদন করে বাজারে নিয়ে আসত।[৯৬]

যেমন- السقاقطة বা সংবাদ বহনকারীরা ইয়াসরিবে আসলে সাথে গম, যব, তেল, ত্বীন ফল ও কাপড় নিয়ে আসত।[৯৭]

ইয়াহূদীরা মুদ্রা বাণিজ্য ও সুদী কারবার করত। আরবরা সুদের বিনিময়ে তাদের নিকট থেকে খাদ্য ও মুদ্রা ঋণ নিত। আবার তাদের নিকট নিজেদের সম্পদ জমাও রাখত। ইয়াসরিববাসী তাদের পার্শ্ববর্তী বেদুঈনদের সাথে এবং সেখানের পথ ধরে শামের উদ্দেশ্যে গমনকারী মক্কার বাণিজ্যিক কাফেলার সাথেও কারবার করত।[৯৮]

যদিও ইয়াসরিবের বাজার সম্পূর্ণরূপে ইয়াহূদীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সেখানের পুরো অর্থনীতি তাদের করায়ত্তে ছিল তবুও ইয়াসরিববাসী চাইলে মক্কার উকায, মাজিন্নাহ বা যুল জিমায বাজারে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য যেমন- তেল, নাবীয, আতর-সুগন্ধি ইত্যাদি আমদানী করতে পারত।[৯৯]

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

---

[৮৬] *তারিখে তবারী- ২/৩৫৭।*
[৮৭] *তারিখে তবারি- ২/৩৫৭।*
[৮৮] *সহীহুল বুখারী- ৩/৭৬, ৯৫, ৯৬।*
[৮৯] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ২/২৬৩-২৬৬।*
[৯০] *আল মুফাযযাল- ৭/২১৪।*
[৯১] *তারিখুল ইয়াহূদ- পৃ. ১৭।*
[৯২] *বুখারী- ৩/৭৮, ৭৯; ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বানী ইস্‌রাঈলের এক স্বর্ণকারের নিকট ইলখির ঘাস বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছিলেন। যে অর্থ দিয়ে তিনি ওলীমার কাজে সাহায্য নিতে পারেন। আল মাগাযী- আল ওয়াকেদি, পৃ. ১৭৮, ১৭৯।*
[৯৩] *ওফাউল ওফা- সামহুদী, পৃ. ১৯৮, ১৯৯।*
[৯৪] *দু'আরুল হিজায- শরীফ, পৃ. ৬৩।*
[৯৫] *ফুতুহিল বুলদান- বালাযারি, পৃ. ২০।*
[৯৬] *আল মাগাযী- পৃ. ১৬।*
[৯৭] *আল মুফাস্‌সাল- ৪/১৪১।*
[৯৮] *সিরাতে ইবনু হিশাম- ১/৪৫০।*
[৯৯] *তাখরীজ- আল খুযাঈ, পৃ. ৬৪৩।*

সালাফি মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা

শাইখ ড. সালেহ বিন ফাওযান আল ফাওযান (হাফিযাহুল্লা-হ)

অনুবাদক : মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার*

[১ম পর্ব]

মুখবন্ধ : যাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ), তার পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কিরামের প্রতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।"[১০০]

﴿يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাক্বওয়া অবলম্বন করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ব দাবী করো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।"[১০১]

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো; তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।"[১০২]

পরকথা হলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি প্রত্যেক রাসূলের মৃত্যুর পর এমন কিছু আলিম তৈরি করেছেন; যারা মানুষদেরকে পথভ্রষ্টতা বর্জন করে হিদায়াতের পথে আহ্বান করেন। যারা তাদের স্ব স্ব উম্মাতের পক্ষ থেকে প্রদত্ত কষ্টে ধৈর্য ধারণ করেন, যারা কুরআন দ্বারা মৃতকে তথা ইসলাম থেকে বিমুখ ব্যক্তিদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেন, যারা অন্ধদেরকে আল্লাহর আলো দ্বারা দৃষ্টিবান করেন। তারা কতই না শয়তান কর্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করলেন! কতই না বিপথগামী বিভ্রান্তকে সুপথের দিশা দিলেন! জনসাধারণের সাথে তাদের আচরণ কতই না সুন্দর ছিল! কিন্তু তাদের সাথে জনসাধারণের আচরণ ছিল কতই না খারাপ! তারা আল্লাহর কিতাব কুরআনুল কারীমকে বাড়াবাড়িকারীদের বাড়াবাড়ি, পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তন ও অপব্যাখ্যাকারীদের অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত করেন। আমরা মনে করি আল্লামা সালেহ বিন ফাওযান আল ফাওযান (হাফিযাহুল্লা-হ) তাদের মধ্যকার একজন।

সম্মানিত শায়খ! বৃহস্পতিবার, তেসরা মুহর্‌রম ১৪৩৫ হিজরি মোতাবেক ৭ই নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে সৌদী আরবে "সালাফি মানহাজ ও তার প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। বাস্তবেই এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বের দাবীদার। কেননা সাহাবীদের যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যতগুলো দল-উপদল বের হয়েছে যেমন শীয়া, খারেজী, রাফেযী, ক্বাদারিয়্যাহ, যাবারিয়্যাহ ইত্যাদি এবং যতগুলো বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটেছে সবগুলোই সালাফদের মানহাজচ্যুত হয়ে ভুল বুঝার কারণে হয়েছে।

'আল মানহাজ' শব্দের বিশ্লেষণ : মানহাজ শব্দের আভিধানিক অর্থ- মানহাজ শব্দটি আরবী ভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে– লোক চলাচল করে এমন রাস্তা সরল, সোজা পথ যাতে কোনো বক্রতা নেই। যা অবলম্বন করা হয়। মুখতারুস সিহাহ গ্রন্থে রয়েছে যে, মিনহাজ বা মানহাজ শব্দের অর্থ হলো, স্পষ্ট পথ।

মোটকথা, মানহাজ হলো– এমন পথ যা সরল সুস্পষ্ট, চায় তা অনুভবযোগ্য হোক বা আধ্যাত্মিক।

এছাড়াও আরবি ভাষায় মানহাজ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়, এমন স্পষ্ট এবং সরল পথকে, যা সঠিকভাবে অনুসরণ করলে সহজে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে একটি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যায়।

মানহাজ শব্দের শরয়ী অর্থ- মানহাজ হলো– এমন পথ যার মাধ্যমে 'ইবাদতের ক্ষেত্রে ও মানুষের সাথে মুআমালাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়। আর কুরআন-সুন্নাহতে মানহাজ শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

* *অধ্যয়নরত, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া। উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকা।*

[১০০] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ১০২।*

[১০১] *সূরা আন্ নিসা : ১।*

[১০২] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৭০।*

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا﴾

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা একটা করে শরীয়াত ও স্পষ্টপথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।"[১০৩]

অর্থাৎ- এমন পথ যাতে তারা চলে, এমন শরীয়ত যা তারা অনুসরণ করে। অনুরূপভাবে হাদীসেও মানহাজ শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেন,

تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُوْنَ.

আল্লাহ তা'আলা যতদিন চাইবেন তোমাদের মাঝে নবুওয়াত থাকবে এরপর আল্লাহ তা'আলা তা উঠিয়ে নিবেন যখন উঠিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে করবেন। এরপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে আবার খেলাফত আসবে অতপর আল্লাহ তা'আলা যতদিন চাইবেন তা অব্যাহত থাকবে।[১০৪]

সালাফ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

সালাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– এই উম্মতের প্রথম প্রজন্ম। তথা মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণ। আল্লাহ বলেন,

﴿وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।"[১০৫]

অন্যত্রে আল্লাহ বিশেষভাবে মুহাজিরদের সম্পর্কে বলেন,

﴿لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ﴾

"এ সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। এরাই তো সত্যাশ্রয়ী।"[১০৬]

তারপর আনসারদের সম্পর্কে বলেন :

﴿وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۭ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

"(আর এ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা মুহাজিরদের আগমনের আগে এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোনো (না পাওয়াজনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। বস্তুতঃ যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।"[১০৭]

অতঃপর মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলিমদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ جَاۗءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

"আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।"[১০৮]

সালাফ দ্বারা আরো উদ্দেশ্য হলো– তাবেয়ীগণ, তাবে তাবেয়ীগণ ও তাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা উত্তম যুগের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ﷺ) উত্তম প্রজন্ম সম্পর্কে বলেছেন,

«خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ».

আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা।[১০৯]

আর তাদের যুগ ছিল পরবর্তীদের যুগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যুগ, এ জন্যই এ যুগকে বলা হয় عصر القرون المفضلة তথা সর্বোৎকৃষ্ট যুগ। এরাই হলো এ উম্মতের সালাফ, উম্মতের আদর্শ, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। যাদের প্রশংসায় রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

«خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ».

আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, অতঃপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা।[১১০] ❑

---

[১০৩] *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৪৮।*
[১০৪] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৮৪০৬।*
[১০৫] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ১০০।*
[১০৬] *সূরা আল হাশ্র : ৮।*
[১০৭] *সূরা আল হাশ্র : ৯।*
[১০৮] *সূরা আল হাশ্র : ১০।*
[১০৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৫১।*
[১১০] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৬৫১।*

পরিবেশ-প্রকৃতি

দূষণচক্রে জেরবার : উৎকণ্ঠায় নগরবাসী

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

[দ্বিতীয় কিস্তি]

দূষণ আর ভেজাল মানুষকে অক্টোপাসের মতো জাপটে ধরেছে। দুধের ভেজাল বলতে আমরা বুঝতাম পানি মেশানো। কিন্তু এখন কী শুনছি! চক পাউডার! আরও অভিনব প্রক্রিয়া! গরুর খাঁটি দুধ থেকে প্রথমে ক্রিম তুলে নেয়া হয়। এরপর সাদা পানিতে মেশানো হয় কস্টিক সোডা, সয়াবিন তৈল ও চিনি। তৈরি হয়ে যায় ঘন ভেজাল দুধ। কথা এখানেই শেষ নয়– গ্লুকোজ, তৈল, রাসায়নিক মিশিয়ে ভেজাল দুধের চলছে রমরমা ব্যবসা। অতঃপর ছানা সমাচার। যা দিয়ে ঘি তৈরি হয়। ছানা তৈরিতে নিম্নমানের ও মেয়াদোত্তীর্ণ গুঁড়া দুধ, আটা-ময়দা মিশিয়ে তৈরি হয় ভেজাল ছানা। আর অবিকল ও তাজা রাখার জন্য মেশানো হয় ফরমালিন। এই ছানার সাথে ক্ষতিকর সোডিয়াম, সাইক্লামেট বা ঘন চিনি মিশিয়ে তৈরি করা হয় নানা রংয়ের বাহারি সাইজের মিষ্টি। এই ঘন চিনি সাধারণ চিনির চেয়ে ৫০ গুন বেশি মিষ্টি হয়। প্রসঙ্গত মিষ্টির কথা এলো, কিন্তু ঘি! ঘিয়ের মিশ্রণ আরও ভয়াবহ!

মাত্র ক'দিন আগে দিনাজপুরের ঘটনা। আমার বন্ধু দিনাজপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ হোসেনকে বললাম, 'খাঁটি ঘি কিনব'। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন'! নিয়ে গেলেন এক বনেদি মুদি দোকানে। দোকানের ক্যাশে বসা ভদ্রলোক দোকানের মালিকের ছেলে। মালিক গতায়ু হয়েছেন। অর্থাৎ- পঞ্চাশ বছরের পুরানো ব্যবসা। ঘি-এর কথা বলতে দোকানদার অকপটে বলে ফেললেন, 'স্যার, বেশি দিন রেখে খাওয়া যাবে না। দু' চার দিনের মধ্যে শেষ করা লাগবে'। বললাম, তা কেন? বললেন, 'স্যার, বুঝছেন তো, পাবনা ঘি বলে চালান আসে। রেখে খেলে ওই ফ্লেভার আর থাকে না'। মহামুশকিল! অবশেষে দোকান থেকে ঘি কেনা হতে বিরত রইলাম। যাবো কোথায়? সর্বত্রই ভেজালের সয়লাব। মিল্ক ফ্যাট ছাড়া ডালডা, সয়াবিন তৈল, পাম ওয়েল ও কালার ফ্লেভার ইত্যাদির সংমিশ্রণ তৈরি করছে ভেজাল ঘি। আরো শুনলে আত্কে যাবার জোগাড়। উদ্ভিজ্জ তৈল ছাড়া পশুর শরীরের চর্বি ঘিতে মেশানো হয়। এছাড়া হাড়ের ধুলো, সীসা ইত্যাদির মতো প্রাণঘাতী উপাদান দিয়ে ঘি তৈরি করছে। বিভিন্ন নামী-দামী কোম্পানীর ব্র্যান্ড ব্যবহার করে হরদম বিক্রি করে চলেছে। সুপ্রিয় পাঠক, ঘি একটা সুপার ফুড। অথচ এর প্রস্তুত প্রক্রিয়াতে নানাবিধ ভেজাল উপাদানের সংমিশ্রণ আমাদের হতবিহ্বল করে তুলেছে। ভেজাল ঘি খেলে ফুড পয়জনিং থেকে শুরু করে একাধিক ক্রনিক অসুখের ফাঁদে পড়ার আশংকা থাকে।

নিত্যদিনের খাবারের প্রয়োজন মেটাতে অন্ততঃ ৫২ ধরনের পণ্যের কথা জানা যায়। এগুলোর মধ্যে বহুল ব্যবহারের মধ্যে পড়ে সরিষার তৈল, চিপস, খাওয়ার পানি, লবণ, হলুদ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, লাচ্ছা, সেমাই, সুঁজি, বিস্কুট, দুধ, দই, ঘি, কারি পাউডার, নুডলস ও মধু ইত্যাদি। তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে চাল। বহুদিন আগের ঈশ্বর গুপ্তের একটা বাণী– আজও ভুলিনি! 'ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল'। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বাংলায় আমদানি হয়েছিল ধানের। আর সময়ের ব্যবধানে এখনো আমাদের প্রধান খাদ্য হলো ভাত। প্রাকৃত পৈঙ্গলের একটি পদে বলা হয়েছে, সে স্বামী ধন্যবান যার নারী রোজ কলাপাতায় গরম ভাত, গাওয়া ঘি, মৌরলা মাছের ঝোল আর নালিতা শাক পরিবেশন করেন। অথচ সেই ভাগ্যবতী রমণীকে আজ বাড়তে হচ্ছে ভেজাল চাল। চালের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে অ্যারারুট। চাল সাদা করতে দেয়া হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড, ওজন বাড়াতে মেশানো হচ্ছে গুঁড়া পাথর, কাঁকর ও ইটের গুড়া। চাল সিদ্ধ করাতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভিটামিন বি। সম্প্রতি চালের বাজারে মিনিকেটের রমরমা ব্যবসা চলছে। এ নামে কোনো ধানই উৎপাদন হয় না। মোটা চাল বিশেষ পদ্ধতিতে সরু করে তৈরি হয় মিনিকেট। চাল সরু করার ফলে প্রাকৃতিক উপাদান আঁশ, ভিটামিন, মিনারেলে প্রোটিন ও এন্টি অক্সিডেন্টের উপাদান থাকে না। ফলশ্রুতিতে ভোক্তারা 'লাইফস্টাইল ডিজিজে' ভোগেন।

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস; **প্রফেসর ও ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, মোটা হওয়া, দ্রুত বার্ধক্য ইত্যকার স্বাস্থ্যগত ঝামেলায় পড়ে যান।

আমি চাকুরীব্যপদেশে ঢাকার আশুলিয়া বসবাস করি। সেদিন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আসতে গিয়ে কানে এলো, 'লাগবে না-কি পোলাওর চাল'। কৌতুহল হলো। দাঁড়াতে বললাম। চমৎকার তো! সুগন্ধ চাল। মাত্র ৮০ টাকা কেজি। ভিমরি খেলাম। বাড়ি আমার দিনাজপুরে। সেখানে সুগন্ধ চাল কাটারি, গুড়া জিরা ১২০ টাকা থেকে দেড়'শ টাকা। আর এখানে ৮০ টাকা! দিন কয়েক পরে দিনাজপুরে এসে একটা বিশ্বস্ত চালের দোকানে কথা তুলতেই বলে ফেললেন, 'স্যার! 'ওতো ফ্লেভার। মাত্র কয়েক ফোটা মিশালেই মনকে মন চাল সুগন্ধ কাঠারি ও গুড়া জিরা বনে যাবে'। এ সকল ভেজাল চাল শুধু ক্ষুধামন্দা পেটের পীড়ার জন্য দায়ী না, এটি আমাদের ফুসফুস, কিডনী ও লিভারের জন্য বড়ই ক্ষতিকর।

পানির অপর নাম জীবন। যা না হলে চলেই না। আমাদের গ্রামের বাড়ির পূর্ব লাগেয়া গোরকই বিল। শৈশবকালে মাছ মারতে গিয়ে দেখিছি কোদালের মাত্র এক কোপ দিলেই পানি উপচে আসতো। আর আজ! শতফুট পাইপ দিলেও পানি আসতে চায় না। পানিতে আর্সেনিক। এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য অভিজাতরা বোতলে পানি খাওয়া শুরু করলেন। উদ্দেশ্য আর্সেনিক মুক্ত নির্ভেজাল পানি। ব্যস! গড়ে উঠলো শতশত কোম্পানী।

প্লাস্টিকের বোতলে এখন সব জায়গায় ভরে গেছে। রয়টার্সের তথ্য মতে, প্রতিদিন ১.৩ বিলিয়ন প্লাস্টিকের বোতল বিক্রি হয়। বছরে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮১ বিলিয়নে। বাজারে যে পানির বোতল বিক্রি হয় তার অধিকাংশই একবার ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিকে তৈরি। এ ধরনের বোতলে দিনের পর দিন পানি পান করলে তাতে বৃদ্ধি পায় শরীরে ক্যান্সারের আশংকা। প্লাস্টিক বোতল তৈরিতে ব্যবহার হয় 'বিসফেনল এ' বা বি পি এ-সহ একাধিক উপাদান, যা দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহারের ফলে দেহে প্রবেশ করতে পারে ক্ষতিকর মাইক্রোপ্লাস্টিক। প্রায় ৯৩ শতাংশ প্লাস্টিকের বোতলেই রয়েছে এই ক্ষতিকর উপাদান। এর ফলে ক্ষতি হতে পারে পরবর্তী প্রজন্মেরও। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, 'টাইপ ৭' নামক এক ধরনের প্লাস্টিক থেকে দেখা দিতে পারে প্রজনন সমস্যা।

টমাস রয়টার্স ফাউন্ডেশন বলেছেন, আমরা আসলে জীবদ্দশায় মাইক্রোপ্লাস্টিকের মাধ্যমে প্রচুর প্লাস্টিক উদরগত হয়। তার পরিমাণ ৪৪ পাউন্ডের মতো। এটি কিন্তু আসে প্লাস্টিকের বোতল ও সামুদ্রিক চিংড়ি মাছের মাধ্যমে। দীর্ঘদিন বোতলগুলো অপরিস্কার থাকার ফলে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক সৃষ্টি হয় যা শরীরের বড়ই জন্য ক্ষতিকর।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, পানির অপর নাম জীবন। এই স্বচ্ছ ও বর্ণহীন পদার্থটি ছাড়া প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজের জন্যও আমাদের পর্যাপ্ত পানি প্রয়োজন। কিন্তু সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজন নিরাপদ বিশুদ্ধ পানি। ব্যস্ত জীবনের অজুহাতে আমরা নিত্যই বোতলজাত পানি ব্যবহার করছি। এসব বোতলজাত পানি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা কখনো খতিয়ে দেখিনি। অতি সম্প্রতি বি এ আর সি (Bangladesh Agriculture Research Council) আঁতকে পড়ার মতো এক তথ্য উপস্থাপন করেছে। তারা ৩৫টি ব্র্যান্ডের বোতলজাত ও ২৫০টি জার পানির নমুনা সংগ্রহ করেছে। গবেষণায় প্রমাণ করেছে যে, প্রায় সব জারের পানি দূষিত। মাত্র কয়েকটি ব্র্যান্ডের বোতলজাত পানি নিরাপদ মিলেছে। বি এ আর সি'র প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, এসব বোতলজাত ও জারের পানিতে আছে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া। যেমন- ই-কলি (Escherichia Coli)। এই ব্যাকটেরিয়া থেকে হতে পারে দীর্ঘ মেয়াদী ডায়রিয়া, মাথাব্যাথা, বমিভাব, পেট ব্যাথা, জ্বর ও ঠাণ্ডা। এছাড়া এটি আস্তে আস্তে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। গবেষণায় বলা হয়েছে, ১০০ মিলি জার পানির নমুনায় ১ থেকে ১৬০০ এমপি এনের বেশি 'ই-কলি' পাওয়া গেছে। যেখানে বিএসটিআই-এর মান অনুযায়ী শূন্য ই-কলি থাকা উচিত।

বিএআরসি ব্র্যান্ড বোতল ও জার পানির বিভিন্ন উপাদানগুলোর পরিমাণগত ও গুনগত মান বিশ্লেষণ করে তার ফলাফল প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায় টি ডি এস, ক্লোরাইড, কলিফরম, ফ্যেকাল কলিফরম, পিএইচ, নাইট্রাইট, নাইট্রেট, লিড, ক্রোমিয়াম আয়রনের উপস্থিতি

বিডিএস ঘোষিত অনুসরনের চেষ্টা করলেও তা যথাযথ নয়। বোতলের গায়ে কলিফরম বা ফ্যেকাল কলিফরমের উল্লেখ থাকে না। অন্যদিকে জার পানি কোনো গুনগত মানই বজায় রাখে না। অসাধু ব্যবসায়ীদের এসব নামহীন কিংবা দূষিত জার পানি ও ব্র্যান্ডবিহীন বোতলজাত পানির ব্যবহারের কারণে মানুষ ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এতো গেল পানির হাল-হকিকত। বাঙালী তো ভাতে মাছে বাঙালী। বর্তমানে আমরী নদী সাগর খালবিলের যে সকল মাছ খাই সেগুলোর কী অবস্থা? কতটা স্বাস্থ্যসম্মত? জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এক গবেষনায় মাছে 'এবজরভড' মাইক্রোপ্লাস্টিক পরিমাণ ভয়ানক মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্রুততম সময়ে মাছ বড় করা বা উৎপাদন বাড়াতে ফিশ ফিডে ভেজাল কোনো না কোনোভাবে মানুষের শরীরে যাচ্ছে। এসব মাছ খেয়ে নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞর মতে ফিডে থাকা লিড, ক্যাডমিয়াম এবং ক্রোমিয়াম প্রতিটিই ভারী ধাতু। বিশেষতঃ লিড ও ক্রোমিয়াম থেকে ক্যানসার, হৃদরোগ, আলসার, কিডনির অসুখ হয়। মানবদেহে অতিরিক্ত ক্রোমিয়ামের উপস্থিতি অকাল প্রসব, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম, অ্যাজমা, শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগের কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

আমরা এতদিন জানতাম মাছকে সজীব ও পচনরোধের জন্য ফরমালিনের ব্যবহার ছিল। এখন যোগ হয়েছে সিলিকাজেল। সিলিকাজেল ঢোকানোর ফলে মাছের ওজন বাড়ে, থাকে সতেজ। সিলিকাজেল মানব দেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। চিকিৎসকদের মতে, এটা মানুষের লিভার ও কিডনীর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দীর্ঘদিন ধরে খেলে কিডনীর স্বাভাবিক কার্য ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং 'মাছে ভাতে বাঙালীরা' আপ্ত বাক্য মাথায় রেখে হুমড়ি খেয়ে পড়লে চলবে না সুস্থ থাকবার জন্য বুঝে শুনে মাছ কিনতে হবে।

সুস্বাস্থের জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন। প্রোটিনের একটি পরিপূর্ণ উৎস মাংস। মানব দেহের সুস্বাস্থ্যের জন্য মাংস প্রয়োজনীয় সকল অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে। মাংস আরও যোগায় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। যেমন- ভিটামিন বি, আয়রন, জিংক প্রভৃতি। সুতরাং মাংস খেতে হবে। কিন্তু মাংসেও ভেজাল! কতিপয় গো-খামারীরা মোটাতাজা করণের লক্ষে মারাত্মক ঔষধাদি ব্যবহার করে থাকেন যা মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষতঃ মামুলিকারণে অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার মাংসকে দূষিত করে তোলে। অতিরিক্ত মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার গরুর লিভার কিডনি ও মস্তিষ্কে জমা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক যুক্ত গরুর মাংস খেলে মানবদেহে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শরীর নামক জৈবিক কাঠামোটি ক্ষতিগ্রস্থ হয় যা তাৎক্ষনিক বুঝা যায় না।

ব্রয়লার মুরগি মাংসের আর একটি সহজলভ্য নাম। কিন্তু এটির উৎপাদন প্রক্রিয়া স্বাস্থের জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুরগির ছানা বড় হওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক ও কেমিক্যাল প্রয়োগ করা হয়। যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। নিয়মিত ব্রয়লার মুরগির মাংস খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়। মানবদেহের অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হ্রাস পায়। ব্রয়লার মুরগিতে ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া থাকে। এই ব্যাকটেরিয়া ফুড পয়জনিংয়ের অন্যতম কারণ। তাছাড়া এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্রয়লার মুরগি খাওয়ার ফলে পুরুষত্ব ঝুঁকির মুখে পড়ে। যেসব পুরুষ নিয়মিত ব্রয়লারের মাংস খান তাদের জন্মদান ক্ষমতা স্বাভাবিক পুরুষের চেয়ে কম। এছাড়া ব্রয়লার মুরগির তাপসহনীয় ক্ষমতা ২৯০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আর রান্না হয় ১০০-১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। ফলে এ বিষাক্ত ক্রোমিয়াম মুরগির মাংস থেকে আমাদের দেহে প্রবেশ করে কিডনি ও লিভার অকেজো করে দিতে পারে। এছাড়া এই বিষাক্ত ক্রোমিয়াম দেহের কোষ নষ্ট করে দেয় যা পরবর্তীতে ক্যানসার সৃষ্টি করে। সুস্থ্য ও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এর প্রভাব কিছুটা কম হলেও গর্ভবতী নারী ও শিশুদের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর। গর্ভাবস্থায় ব্রয়লার মুরগি নিয়মিত খেলে ভূমিষ্ট শিশু বিকলাঙ্গ, অপুষ্ট ও মানসিক ভারসাম্যহীন হতে পারে। শিশুরা খেলে মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়, শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এমনকি পাকস্থলী, তন্ত্র, বডি সেল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বডি ইমিউনিটি কমিয়ে দেয়। সুতরাং ব্রয়লার মুরগির মাংসের ব্যবহারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। *[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]*

ক্বাসাসুল হাদীস

মু'মিনের 'ইবাদত ধ্বংসের ফাঁদ 'রিয়া'

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

মু'মিনের 'ইবাদত ধ্বংস করে তাকে জাহান্নামী বানানোর জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ 'রিয়া'। কুরআন-হাদীসে রিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রিয়া (الرياء) অর্থ- প্রদর্শন করা বা প্রদর্শনেচ্ছা। মহান আল্লাহর জন্য করণীয় 'ইবাদত পালনের মধ্যে মানুষের দর্শন, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বলে।

ইবনু গানাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি এবং আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মসজিদে জাবীয়াতে প্রবেশ করলাম, তখন আমাদের সাথ 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সাক্ষাত হলো। তিনি বাম হাত দিয়ে আমার ডান হাত ধরলেন এবং তার ডান হাত দিয়ে আবূ দারদার বাম হাত ধরলেন। এভাবে আমরা বের হয়ে চলতে লাগলাম এবং গোপন আলাপ করছিলাম, আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন আমরা কি সম্পর্কে আলাপ করছিলাম অর্থাৎ- তারা রিয়া সম্পর্কে কথা বলছিল।

তখন 'উবাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, যদি তোমাদের কারও দীর্ঘ জীবন অথবা উভয়েই দীর্ঘ জীবন লাভ কর, তবে তোমরা মুসলমানদের মধ্যে উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন কাউকে দেখতে পাবে যে, সে রাসূল (ﷺ)-এর যবানে কুরআন তিলাওয়াত করছে, আবার পুনরাবৃত্তি করছে এবং প্রকাশ করছে, আর হালালকে হালাল করছে এবং হারামকে হারাম করে শরীয়াতের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছে। অথচ সে তোমাদের মধ্যে মৃত গাধার মাথা যেমন মূল্যহীন, সেও তেমনি মূল্যহীন বিবেচিত হবে। (রিয়ার কারণে) আমরা যখন এ অবস্থায় ছিলাম, তখন আমাদের নিকট শাদ্দাদ ইবনু 'আউস এবং 'আউফ ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদের নিকট বসলে শাদ্দাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে মানুষ! আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে গোপন কামনা ও শির্ক সম্পর্কে যা বলতে শুনেছি, সে সম্পর্কে যেভাবে আমি ভয় করছি, তোমাদেরকে ও সেভাবে ভয় দেখাচ্ছি! তখন 'উবাদা ইবনু সামিত ও আবূ দারদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন,

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো। মহান আল্লাহর রাসূল কি আমাদেরকে বলেননি, শয়তান আরব ভূমিতে তার 'ইবাদত থেকে নিরাশ হয়েছেন। আর গোপন কামনা, আর সে সম্পর্কে আমরা জানি, তা হলো দুনিয়ার প্রতি আসক্তি যা নারীর প্রতিও কামনা বাসনা। কিন্তু হে শাদ্দাদ! তুমি আমাদেরকে যে শির্ক সম্পর্কে ভয় দেখাচ্ছ, সেটা কি!

তখন শাদ্দাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তোমরা কি দেখো না, যদি তোমরা দেখো কোনো ব্যক্তি অন্যকে প্রদর্শনের জন্য নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং সাদাক্বাহ্ করে? তোমরা কি দেখো না যে, সে শির্ক করে? তারা বললো, হ্যাঁ। আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রদর্শনের জন্য নামায পড়ে অথবা রোযা রাখে অথবা সাদাক্বাহ্ করে, সেই শির্ক করে।

এরপর শাদ্দাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য নামায পড়ে, সেই-ই শির্ক করে; যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য রোযা রাখে, সেই-ই শির্ক করে এবং যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য সাদাক্বাহ্ করে, সেই-ই শির্ক করে।

তখন 'আউফ ইবনু মালিক বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বান্দার ঐ সমস্ত 'আমলের দিকে দৃষ্টি দেন, যা একনিষ্ঠভাবে তার জন্য করা হয়। আর যার সাথে অন্যকে শরিক করা হয়, সেগুলো বাদ দিতে পারেন না।

তখন শাদ্দাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি আমার সাথে কাউকে শরিক করে, আমি তার থেকে দায়মুক্ত। আমার সাথে যদি কেউ কোনো কিছুতে শরিক করে, তার কম বেশি যাবতীয় 'আমল ঐ শরিকের জন্য, যার সাথে আমাকে শরিক করা হয়েছে, আমি তার মুখাপেক্ষী নই।[১১১]

রিয়ার কারণ সমাজের মানুষদের কাছে সম্মান, মর্যাদা বা প্রশংসার আশা। আমাদের বুঝতে হবে যে, দুনিয়ায় কোনো মানুষই কিছু দিতে পারে না। যে মানুষকে দেখানোর বা শোনানোর জন্য, যার প্রশংসা বা পুরস্কার লাভের জন্য আমি লালায়িত হচ্ছি সে আমার মতোই অসহায় মানুষ। আমার কর্ম দেখে সে প্রশংসা নাও করতে পারে। হয়ত তার প্রশংসা শোনার আগেই আমার মৃত্যু হবে। অথবা প্রশংসা করার আগেই তার মৃত্যু হবে। আর সে প্রশংসা বা সম্মান করলেও আমার কিছুই লাভ হবে না। আমার পালনকর্তার পুরস্কারই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি অল্পতেই খুশি হন ও বেশি পুরস্কার দেন। তিনি দিলে কেউ ঠেকাতে পারে না। আর তিনি না দিলে কেউ দিতে পারে না। নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলে ছোট-বড় সকল প্রকার শির্ক থেকে বাঁচা যায়।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

'হে আল্লাহ! জেনেশুনে তোমার সাথে শির্ক করা থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং অজ্ঞতাবশে শির্ক করা থেকে আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'[১১২] ❑

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

[১১১] *আহমাদ- ই. ফা. বাং., হা. ৪৪।*

[১১২] *আদাবুল মুফরাদ- হা. ৭১৬; সহীহুল জামে'- হা. ৩৭৩১।*

বিশেষ মাসায়িল

নফল সালাত মসজিদে না গৃহে আদায় করা উত্তম?

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্র : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : আমরা যারা মসজিদে জামা‘আতে সালাত আদায় করে থাকি তাদের অধিকাংশই সুন্নাত ও নফল সালাতও মসজিদেই আদায় করতে পছন্দ করি। বাস-গৃহের সালাতের চেয়ে মসজিদের সালাতই উত্তম এবং তা আদায়েরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সালাত সুন্নাত-নফল নয়, তা হলো ফর্য। ফর্য সালাত আদায় করতে হবে মসজিদে। অতঃপর মসজিদে সুন্নাত-নফল সম্পন্ন করলে তা আদায় হবে ঠিকই। কিন্তু তা কোনোক্রমেই উত্তম নয়। যায়িদ ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «صَلَاةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ».

“নবী (ﷺ) বলেছেন : ফর্য সালাত ছাড়া তোমাদের বাড়িতে আদায়কৃত সালাত আমার এই মসজিদে আদায়কৃত সালাত হতে উত্তম।”[১১৩]

ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «اجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا».

নবী (ﷺ) বলেছেন : তোমরা তোমাদের কিছু সালাত তোমাদের বাড়িতে আদায় করো। তাকে কবরস্থানে পরিণত করো না।”[১১৪]

এখানে কিছু সালাত বলতে নফল সালাতসমূহকে বুঝানো হয়েছে। সহীহ মুসলিমে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِيْ مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِيْ بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا».

“তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কারো মসজিদে সালাত আদায় শেষ হলে সে যেন কিছু সালাত বাড়িতে আদায়ের জন্য রেখে দেয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা তার এ সালাতের জন্য তার বাড়িতে কল্যাণ দান করবেন।”[১১৫]

এখানে কিছু সালাত বলতে নফল সালাতসমূহকে বুঝানো হয়েছে। যায়িদ ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করো। কেননা ফর্য সালাত ব্যতীত কোনো ব্যক্তির অন্যান্য সালাত তার বাড়িতে আদায় করা অধিক উত্তম।”[১১৬]

‘আব্দুল্লাহ ইবনু সা‘দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বলা হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَيُّمَا أَفْضَلُ؟ الصَّلَاةُ فِيْ بَيْتِيْ أَوِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ : «أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِيْ؟ مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً».

“তিনি বলেন, একদা আমি আমার ঘরে এবং মসজিদে সালাত আদায়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিক উত্তম তা রাসূলুল্লাহ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি কি দেখছ না যে, আমার ঘর মসজিদের কত কাছে হওয়া সত্ত্বেও আমি ফর্য সালাত ছাড়া অন্যান্য সালাত মসজিদের তুলনায় নিজের ঘরে আদায় করা অধিক পছন্দ করি।”[১১৭]

সহীহ সনদে যায়িদ ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «صَلَاةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ».

“রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ফর্য সালাত ছাড়া কোনো ব্যক্তির অন্যান্য সালাত তার ঘরে আদায় করা আমার এই মাসজিদ আদায় করার চাইতেও উত্তম।”[১১৮]

---

[১১৩] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১০৪৪, সহীহ।*
[১১৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৩২।*
[১১৫] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭৭৮/২১০।*
[১১৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭৩১।*
[১১৭] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৩৭৮, সনদ সহীহ।*
[১১৮] *সুনান আবূ দাউদ- হা. ১০৪৪।*

হাসান হাদীসে দামরাহ ইবনু হাবীব (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জনৈক সাহাবীর উদ্ধৃতে বলা হয়েছে,

عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِيْ بَيْتِهِ عَلَى صَلَاتِهِ، حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ كَفَضْلِ الْفَرِيْضَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ.

"তিনি বলেন, জনসম্মুখে সালাত (নফল) আদায়ের চেয়ে কোনো ব্যক্তির নিজ বাড়িতে আদায় করাটা তেমনি বেশি ফযীলতপূর্ণ যেমন ফযীলত রয়েছে নফলের উপর ফর্‌যের।"[১১৯]

সা'দ ইবনু ইসহাক-এর দাদা কা'ব ইবনু উজরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِيْ مَسْجِدِ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُوْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوْتِ».

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার 'আব্দুল আশাহাল গোত্রের মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। যখন তিনি সালাত শেষ করলেন তখন কিছু লোক নফল সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : তোমাদের এ নফল সালাত ঘরেই আদায় করা উচিত।"[১২০]

নফল সালাত বাড়িতে তথা লোকচক্ষুর অন্তরালে আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে। যেমনি বাড়িতে নফল সালাত আদায়কে উত্তম বলা হয়েছে তেমনি নাসিরউদ্দিন আলবানী সহীহ হিসেবে তাহ্‌ক্বীক্বকৃত জামি'উস সাগীর গ্রন্থে সুহাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : الصَّلَاةُ تَطَوُّعًا حَيْثُ لَا يرَاه أَحَدٌ مِثْلُ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ صَلَاةً عَلَى اَعْيُنِ النَّاسِ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : লোক চক্ষুর অন্তরালে নফল সালাত আদায়ের পঁচিশগুণ বেশি ফযীলতপূর্ণ ঐ নফল সালাতের চেয়ে যা মানুষের চোখের অন্তরালে করা হয়।"[১২১] ❑

[১১৯] *বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান, হা. ২৯৮৯।*
[১২০] *সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৬০০।*
[১২১] *ইবনু শাহীন- হা. ৬৭, সহীহ জামি'উস সাগীর- হা. ৩/২৫৪।*

দু'আর আবেদন

০১. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম উপদেষ্টা ও ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ মঞ্জুরে খোদা গলব্লাডার অপারেশন পরবর্তী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন আছেন। তাঁর আরোগ্য কামনা করে সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী।

০২. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী'র মাতা বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি তাঁর মায়ের আরোগ্য কামনা করে সকল মুসলিমকে দু'আ করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

মৃত্যু সংবাদ

০১. আগরদাঁড়ী রহিমা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী হেড মাস্টার (অব.) গোবরদাঁড়ী নিবাসী মাস্টার আব্দুলাহেল বাকী (৭৫) তার নিজ বাসভবনে গত ১৬ ডিসেম্বর শনিবার মৃত্যুবরণ করেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের বুধহাটা এলাকার জেনারেল কমিটির একজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য ছিলেন। গোবরদাঁড়ী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে মাইয়্যিতের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়; ইমামতি করেন জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম। তিনি তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক ছিলেন। সাতক্ষীরা জেলা জমঈয়তের পক্ষ থেকে মাইয়্যিতের মাগফিরাত কামনা করে সকলকে দু'আ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

০২. গাইবান্ধা জেলা জুমারবাড়ী এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্জ দেলোয়ার হোসেন সরকার গত ৩১ ডিসেম্বর রবিবার সকাল ১০টায় বার্ধক্যজনিত অবস্থায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃতকালে তার বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। তার স্ত্রী ৪ ছেলে ৪ মেয়ে অনেক আত্মীয়জন রেখে গেছেন। পরিবারের পক্ষ হতে মাইয়্যিতের বড় জামাতা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটির সদস্য আলহাজ্জ মাস্টার শাহজাহান সরকার মাইয়্যিতের জন্য সকল মুসলিমের কাছে মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

সমাজচিন্তা

চাহিদা যখন সরকারি চাকরিজীবী পাত্র

–সাইফুল্লাহ ত্রিশালী

আই নোয়াখালীর মাইয়া। সাত ভাই আর তিন বোনের মইধ্যে ছোড। বেগ্গেগানে আঁর চাইতে বড়। হেতারা কেউ চাকরিজীবী কেউ কাম করি খায়। বোনেগর বালা জায়গায় শাদী অইছে। বড় বোনের জামাই হানের ব্যবসা করে। দুলাভাই হান (পান) খায়। হেতে হাসলে ভয় লাগে। মুখের ভেতরটা কেমন ধূসর বর্ণের বিশাল এক গর্তের মতো দেখায়। ছোড বোনের জামাই মাশাল্লাহ কাচাঁ মরিচের ব্যবসায় বেশ উন্নতি করিছে। একবার তো কাঁচা মরিচের ভর্তা খাইয়া...। মুখ যে হা করছিলাম তিন ঘন্টা বন্ধ করতে হারি নো। জিহ্বাটা ঝুইলা হরছিল। তাই দেইখা কতকজন আজেবাজে টিটকারি মারছিল। থাক বাদ দেন। আমি নাকি দেখতে সুন্দর অইছি। বাপজান কইছে। ছোট ভাই যদিও আরে পটেটো কয়া চেতায়! বড় দুইবোন কালিয়া সুন্দরী। আঁই শ্যাম-বরণ সুন্দরী। এইট ক্লাশে তিনবার ফেল মারছি। তয় কি অইছে! নাইন ক্লাশে ইস্কুর জইন্যে আইটকা গেছিলাম। রমজিত স্যার বালা মানুষ না। হেতে কী বিজ্ঞানে আঁরে হাঁছটা (পাঁচ) নম্বর দিতে হাইত্তো নো? তার হালের গরু কী মইরে যাইতো? নম্বর কী তার বাপ দাদার সম্পত্তি? জাউগ্গা। আব্বাজান ঠিক করিছে, একখান বালা হোলা দেখি আঁর শাদী দিবে। মা'য় তো স্বপ্ন দেখতেছে সরকারি চাকরিজীবী সুন্দর একখান রাজপুত্রের।

পাঠক, এটি একটি প্রতিকী গল্পের অংশবিশেষ। তবে এই গল্পের বাস্তবতা আজ দেশের ৯০ শতাংশ পরিবারে। নিজের সন্তান যেমনই হোক কলিজার টুকরো মনে হয়। তাইতো যোগ্যতার বিচার না করে চাহিদাটা থাকে আকাশ ছোঁয়া। জীবনে সুখে থাকার সুদীর্ঘ চিন্তা প্রতিটি মানুষকে ব্যস্ত রাখে। তবে বিবাহের ক্ষেত্রে অতি বাসনা কোনো পক্ষের জন্যেই ভালোনা। হিতে বিপরীতও ঘটে। অতি যোগ্য আর প্রতিষ্ঠিত পাত্র-পাত্রি খুঁজতে যেয়ে বিয়ের ট্রেন ফেল করা যাত্রীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। বিবাহিত জীবনের সুখ-সৌন্দর্য্য থেকে বঞ্চিত আজ হাজার হাজার যুবক-যুবতী। এজন্য দায়ী অনেক পিতা-মাতার মাথামোটা চিন্তা। দায়ী তাদের খামখেয়ালী। প্রাপ্ত বয়সে বিয়ে না হলে সন্তানের কুকর্মের দায়ভার কী তারা এড়িয়ে যেতে পারবেন?

বিয়ে করার সেরা সময় কখন : দাওয়াত পাচ্ছি না কেন– একটি নির্দিষ্ট বয়স পেরোলেই তরুণ-তরুণীদের দিকে ছুটে যায় এমন ইঙ্গিতপূর্ণ জিজ্ঞাসা। একটি নির্দিষ্ট বয়স নিশ্চয়ই আছে, যে বয়সটা সংসার গুছিয়ে আনার জন্য সবচেয়ে ভালো। গুহামানবদের যুগ থেকেই এ বিষয়টি ধ্রুবসত্য! ১৩-১৪ বছর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্ত হলেও বিবাহিত জীবন বা পারিবারিক জীবনে তারা ঢুকত আরও পরে। আধুনিক সমাজও এটা মেনে চলে। এ নিয়ে ২০১৫ সালে একটি গবেষণা চালিয়েছে ইউটাহ বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষক নিকোলাস উলফফিঙ্গার দাবি করেন, বিয়ের আদর্শ সময় খুঁজে পেয়েছেন তিনি। বিবাহিত জীবন দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সবাইকে ২৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে বিয়ে করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উলফফিঙ্গার লিখেছেন, বয়স বিশের শেষভাগে পৌঁছলে বিয়েতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা কম থাকে। তবে বয়স যখনই মধ্য ত্রিশ পার হয়ে যায়, ততই সে ঝুঁকি আবার ফিরে আসে। এ গবেষণা শুধু পশ্চিমা বিশ্বের জন্য নয়, সব দেশ ও সংস্কৃতির জন্যই সঠিক বলে দাবি উলফফিঙ্গারের।

তবে বিয়ের আদর্শ সময় প্রিয় নবী (ﷺ)-এর জীবনী থেকেই আমরা পাই। নবী করিম (ﷺ) ২৫ বছর বয়সে প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাই ইসলামী প্রথা বলি বা সুন্দর আদর্শময় জীবনের কথা বলি– বিয়ের উপযুক্ত সময় আমাদের শরীয়ত থেকেই পাই। পুরুষদের জন্য ২০-২৫ বছর, মহিলাদের জন্য ১৬-২০। তবে বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া, জলবায়ু, বংশগত পার্থক্য অনুযায়ী মানুষের গ্রোথ নির্ধারিত হয়। বয়সের আগে পরে তারতম্য হতে পারে। যেমন কিছু আরব রাষ্ট্র বা আফ্রিকার কিছু মানুষের হরমোন জনিত বা খাদ্যাভ্যাসের কারণে অতি অল্প বয়সেই তারা যৌবনে পা রাখে। এ

ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তাদের ছেলেরা ১৫-১৮ বছর ও মেয়েরা ১১-১৪ বছর বয়সেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। আমাদের রাষ্ট্রিয় আইনে মেয়েদের ১৮ ও ছেলেদের ২১ বছর নির্ধারণ করা আছে। ২০১৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশে বিয়ের বয়স ছেলেদের জন্য ১৮ এবং মেয়েদের জন্য ১৬-কে অনুমোদন দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে তা বাতিল হয়। ২০১৬ সালের ২৫ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার মেয়েদের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে (পিতামাতার সম্মতি এবং আদালতের অনুমতিক্রমে) ১৮ বছর করা হয়। খসড়ায় উল্লেখ আছে, 'যুক্তিসংগত কারণে মা-বাবা বা আদালতের সম্মতিতে ১৬ বছর বয়সে কোনো নারী বিয়ে করলে সেই ক্ষেত্রে তিনি "অপরিণত বয়স্ক" বলে গণ্য হবেন না।' (তার মানে ১৮ বছরের আগে ছেলে-মেয়ে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলে, বয়স ১৫/১৬ যাই হোক বিয়ে দেয়া যাবে) আমাদের দেশের সচেতন মহল এ আইনটিকে স্বাভাবিকভাবে নেননি। তারা মনে করেন, দেশে ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। এমতাবস্থায় বিয়ের সময় দীর্ঘায়ীত হলে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা বেড়ে যাবে। কেউ কেউ তো তীর্যক মন্তব্য ছুঁড়ে দেন। '১৮ বছরের আগে বিয়ে করা জায়িয নেই, তাইলে কী প্রেম করা জায়িয আছে? যত্তসব ফালতু আইন।' তবে জনগণের মন্তব্য যাইহোক, আমরা কিন্তু দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

পুরুষের বিয়ের জন্য যেসব যোগ্যতা দরকার : বিয়ের জন্য বরের অন্যতম যোগ্যতা হচ্ছে– 'দ্বীনদারি ও চারিত্রিক পবিত্রতা।' অর্থাৎ- যে বর মহান আল্লাহকে ভয় করে ফর্‌য 'ইবাদতসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকে। আর আচার-আচরণগত দিক থেকে উত্তম হয়, সেই বরই বিয়ের জন্য উপযুক্ত ও উত্তম। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, 'তোমাদের কাছে যদি এমন পাত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে- যার দ্বীনদারি ও চরিত্র তোমাদের কাছে পছন্দনীয়; তবে তার সঙ্গে তোমাদের কন্যাদের বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তোমরা এরূপ না করো তবে এর কারণে জমিনে অনেক বড় ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে।[১২২]

[১২২] *জামে' আত্ তিরমিযী।*

অনেকে আবার দুনিয়ার অর্থ-সম্পদের বিষয়টিকেও উপযুক্ত বরের শর্ত হিসেবে দেখে থাকেন। আসলেই তা যথার্থ নয়। কেননা আল্লাহ ঘোষণা দেন–

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের বাকি, তাদের বিয়ে সম্পাদন করে দাও আর তোমাদের দাস ও দাসিদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও (বিয়ে দাও)। তারা যদি সম্পদহীন নিঃস্ব ও ফকির হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সবাইকে সচ্ছলতা দান করবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[১২৩]

কুরআন-সুন্নাহর ঘোষণা অনুযায়ী ইসলামিক স্কলাররা বিয়ের কুফু বা উপযুক্ত হওয়ার জন্য বর নির্বাচনে চারটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিয়ের সময় বরের যে জিনিসগুলো দেখা আবশ্যক, তা হলো–

১. ধর্ম তথা দ্বীনদারি : ধর্মহীন কোনো কাফিরের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া যাবে না। আবার নেককার কন্যাকে ফাসেকের সঙ্গেও বিয়ে না দেয়া।

২. স্বাধীন : কোনো স্বাধীন কন্যাকে পরাধীন তথা ক্রীতদাসের কাছে বিয়ে না দেয়া।

৩. বংশ মর্যাদা : ভালো কাজের জন্য সুনাম আছে এমন বংশের বরের কাছে কনে বিয়ে দেয়া। নিচু বংশের কারো সঙ্গে কনের বিয়ে না দেয়া।

৪. পেশা : আর যদি কনে ভালো ও উচ্চ বংশের হয় তবে নিচু বংশের (নাপিত, ধোপা ও মুচির সম পর্যায়ের) কারো সঙ্গে বিয়ে না দেয়া। ইমাম মোল্লা 'আলী ক্বারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'ধর্ম ও চরিত্র ব্যতীত পাত্রের যদি আর কোনো উপযুক্ত বিশেষণ না থাকে এবং কনে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তবে বিয়ে বিশুদ্ধ হতে কোনো অসুবিধা নেই।' মনীষী ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বরের জন্য দ্বীনদারি চারিত্রিক পবিত্রতাকে যথাযথ উপযুক্ত উত্তম গুণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

উপযুক্ত ছেলেকে যদি বাবা-মা বিয়ে না দেয় সে ক্ষেত্রে করণীয় কী : ধরা যাক ছেলের আর্থিক, শারীরিক এবং মানসিক সক্ষমতাও আছে কিন্তু বাবা-মা বিয়ে দিতে

[১২৩] *সূরা আন্ নূর :৩২।*

চায় না। এত সক্ষমতার পরও অনেক বাবা-মা মনে করেন তাদের সন্তান নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। তাহলে কী এতদিন তাদের ছেলে অন্যের পায়ে ভর করে হেটেছে? নাকি পা থাকতেও সন্তানকে ইচ্ছকৃত খুঁড়া বানিয়ে রেখেছে? এক্ষেত্রে উপযুক্ত এসব ছেলেদের করণীয় কী? আসলে বিয়ের উপযুক্ত আর্থিক সক্ষমতা থাকা যে কোনো যুবকের জন্য অশ্লীলতা, অবৈধ যৌনাচার ও নানা গুনাহে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে, তাদের দ্রুত বিয়ে দেওয়া ফর্‌য। আর ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের মাযহাব অনুযায়ী– ছেলে-মেয়ে উভয়ের বিয়ে দেওয়া সামর্থ্যবান বাবার জন্য ওয়াজির বা আবশ্যক।

বলা হয়ে থাকে, ছেলে যদি সবদিক থেকে উপযুক্ত হয়, বাবা-মা বা অভিভাবক বিয়ে দিতে সম্মত না হয় তবে গুনাহ থেকে বাঁচতে ছেলের করণীয় হলো–

(১) আপন বাবা-মা এবং পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে বিয়ের জন্য তাদেরকে রাজি করানোর চেষ্টা করা। পরিবারের সবার সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে যদি বিয়ে হয় তবে তা নিঃসন্দেহে অতি উত্তম। এতে পারিবারিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি অটুট থাকে। নয়তো একলা চলো নীতি অবলম্বন করলে ক্ষতি নেই।

(২) বাবা-মা ও পরিবারের লোকজন যদি বিয়ের সম্মতি না দেয় তবে অশ্লীলতা, অবৈধ যৌনাচার ও নানা পাপাচার থেকে আত্মরক্ষার স্বার্থে নিজ সিদ্ধান্তে পছন্দনীয় মেয়ের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বিয়ে করা। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে উপযুক্ত ছেলের এভাবে বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই। কারণ, ইসলাম কোনো পুরুষের বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য তার বাবা বা অভিভাবকের অনুমতি নেওয়াকে শর্ত করেনি। যেমনটি নারীর বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য অভিভাবকের সম্মতি শর্ত।

(৩) পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য আলাদা সংসার গড়ে তুলুন। ইসলামী শরীয়াতে এটিও দোষণীয় নয়। অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে পরিবারের সম্মতি ছাড়া বিয়ে করায় বাবা-মা কষ্ট পেলে কি ছেলে গুনাহগার হবে? ইসলাম মা-বাবার প্রতি যে দায়িত্ব পালনের দিকনির্দেশনা দিয়েছে, ছেলে যদি সে দায়িত্ব যথাযথ পালন না করে তবে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু ইসলামের বিধান মেনে পাপাচার থেকে বাঁচতে গিয়ে ছেলে যদি পরিবারের অমতে বিয়ে করে আর তাতে বাবা-মা কষ্ট পায় তবে এক্ষেত্রে ছেলে গুনাহগার হবে না। কারণ, সে মহান আল্লাহর নিষেধকৃত কোনো কাজ করেনি; বরং জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ইসলামের বিধানের আলোকে বৈধভাবে বিয়ে করেছে।

বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামতের দরকার আছে কি না : আছে মানে! ১০০% আছে। আপনি বাবা হতে পারেন। আপনি মা হতে পারেন, সন্তানের ন্যায্য অধিকার কিন্তু হরণ করতে পারেন না। নারী-পুরুষ কারো সম্মতি বা অনুমতি ছাড়া অভিভাবক একজনকে অপরজনের সঙ্গে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়া মোটেও ইসলামের মূলনীতি নয়; বরং তা কুরআনের বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا﴾

"হে ইমানদারগণ! জোরপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছো তার কিয়দাংশ নিয়ে নাও। কিন্তু তারা যদি কোনো প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"[১২৪]

সুতরাং মু'মিন মুসলমানের উচিত নারীদের সম্পদ বা মহরের ব্যাপারে যেমন জোর প্রয়োগ করা যাবে না তেমনি নারীদের বিয়ের ক্ষেত্রেও অনুমতি না নিয়ে জোর করা যাবে না। বিয়ের আগে নারীর অনুমতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য

[১২৪] *সূরা আন্ নিসা : ১৯।*

গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। তাই কোনোভাবেই অনুমতি বা সম্মাতি নেয়া ছাড়া কাউকেই বিয়ে দেয়া উচিত নয়। যদি এর বাত্যয় ঘটে, তবে মনে রাখতে হবে প্রত্যেক নারীই তার বিয়ে বাতিলের অধিকার রাখে। একাধিক হাদীসের বর্ণনা থেকে তা প্রমাণিত। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, সায়্যিবাহ (আগে বিয়ে হয়েছে এমন তালাকপ্রাপ্তা বা বিধাব) বিবাহিতা নারীর মতামত বা সম্মাতি গ্রহণ ছাড়া তার বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং কুমারী নারীকে তার অনুমতি ব্যতিতও বিয়ে দেওয়া যাবে না।' তারা (সাহাবায়ে কিরাম) বললেন, কুমারী নারীর অনুমতি আবার কিভাবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'তার চুপ থাকাই অনুমতি।'[১২৫]

কোনো নারীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হলে অনেক সময় লজ্জায় নারী কোনো কথা না বলে চুপ থাকে। নারীর এ নীরবতাকেই সম্মাতি বলে ধরে নেয়া হবে। আর কোনো নারী যদি প্রস্তাবে রাজি না থাকে তবে তার প্রস্তাব বাতিল করার বিষয়টি জানিয়ে দেওয়ার অধিকার আছে। সে কারণেই প্রস্তাব পছন্দ না হলে ইসলামের রীতি অনুযায়ী বিষয়টি সরাসরি জানিয়ে দেওয়াই উত্তম। খানসা বিনতু খেজাম আনসারি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, তিনি একজন বিবাাহিতা (আগে বিয়ে হয়েছিল এমন) নারী ছিলেন। তার বাবা তর অনুমতি ছাড়াই তাকে (পুনরায়) বিয়ে দেন। আর তিনি এ বিয়েকে অপছন্দ করেন। খানসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিষয়টি নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর কাছে আসলে তিনি তার বিয়েকে বাতিল করে দেন।[১২৬] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই কুমারী মেয়েরা লজ্জা করে বা লজ্জাশীল হয়। নবী (ﷺ) বলেন, (বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর) তার চুপ থাকাটাই সম্মাতি।'[১২৭] সুতরাং হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী যাকে বিয়ে দেওয়া হবে সে কুমারি কিংবা তালাকপ্রাপ্তা বা বিধাব হোক সব ক্ষেত্রেই বিয়ে দেওয়ার আগে অবশ্যই অনুমতি, মতামত বা সম্মতি নিতে হবে। নতুবা চাইলে ওই নারী পরে এ বিয়ে বাতিল করে দিতে পারবে।

[১২৫] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[১২৬] *সহীহুল বুখারী।*
[১২৭] *সহীহুল বুখারী।*

সরকারি চাকরীজিবী পাত্রই কেন খুঁজতে হবে : এটি একটি অসুস্থ মানসিকতা যে, আমার মেয়ের জন্য সরকারি চাকুরীজিবী পাত্রই লাগবে। একটা সময় পেরিয়ে গেলে আমরা বুঝতে পারি, অনেক ভুল সিদ্ধান্ত পরিবারের জন্য কত বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু অর্থ-সম্পদ পরিবারে সুখ নিয়ে আসতে পারে না। কথাটি নীতি বাক্যে মানলেও বাস্তবে আমরা কয়জনে মানি। দেশে ২৫% মহিলার সংসার ভাঙে শুধু অপছন্দের পাত্রের সাথে বিয়ে দেয়ার কারণে। এমনকি ১৫% মহিলা/পুরুষ আত্মহত্যা করে বাবা-মা'র ভুলের কারণে। ১৯ জানুয়ারী ২০২০ যুগান্তর পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী– দেশে মোট ১২ লাখ ১৭ হাজার ৬২জন সরকারি চাকুরিজীবী রয়েছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মো. ফরহাদ হোসেন। স্ট্যাটিসটিকস অব সিভিল অফিসার্স অ্যান্ড স্টাফস ২০২১ প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের সরকারি চাকুরিজীবীর সংখ্যা মাত্র ১৫ লাখ ৫৪ হাজার ৯২৭জন। তাদের মধ্যে নারী ৪ লাখ ৪ হাজার ৫৯২জন, যা মোট চাকুরিজীবীর প্রায় ২৬ শতাংশ। ১১ লাখ চাকুরিজীবী পুরুষের মধ্যে বিবাহিত প্রায় সাড়ে ৯ লাখ। বাকী থাকল প্রায় দেড় লাখের মতো। এর মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার মেয়ে চাকুরিজীবী। আপনার পাত্র তো সোনার হরিণ। আমরা জানি দেশে কর্মজীবী মানুষের মোট সংখ্যা হলো ৬ কোটির উপরে। ১১ লাখ বাদ দিলে থাকে ৫৯ কোটি ৮৯ লাখ। মোট জনসংখ্যার হিসেবে দেশে দৈনিক বিয়ে সম্পাদন হয় প্রায় ১৬০০/১৭০০টি। মাসে প্রায় ৫১০০০টি। বছরে প্রায় ৬ লাখ ১২ হাজার বিয়ে হয়। তাহলে বছর শেষে সরকারি চাকুরিজীবী পাত্র এক লাখের মতো। এর মধ্যে আবার ৩য়/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী মানে দাড়োয়ান, ঝাড়ুদার আছেন। তারাও তো সরকারি চাকুরিজীবী। বাকী ৫.৫ লাখ অভিভাবক তো মেয়ের বিয়ের জন্য সরকারি চাকুরিজীবী পাত্র পাচ্ছেন না। তাহলে তারা তাদের মেয়েদের দিয়ে কী ঘরের খুঁটি দিবেন। সেটাও তো সম্ভব নয়। তাহলে...? *[বি. দ্র. সংগৃহীত ও পরিমার্জিত। অনাকাঙ্খিত তথ্য বিভ্রাট হলে ক্ষমাপ্রার্থী।]*

হিজড়া : ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতা কোন পথে মানব সভ্যতা?

সংকলন : আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ

[২য় পর্ব]

হিজড়াদের বিধিবিধান সম্পর্কে ইসলাম কি বলে?

আল্লাহ তা'আলা গোটা কুরআনে কারিমে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসে কখনো নারীদের জন্য আলাদাভাবে বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন, কখনো পুরুষের জন্য আলাদাভাবে বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন, আবার কখনো নারী পুরুষ উভয়কেই সম্মিলিতভাবে বিধিবিধান বর্ণনা করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে হিজড়ারা যেহেতু পুরোপুরি পুরুষ নয় আবার পুরোপুরি নারীও নয়। তবে সামগ্রিকভাবে নারী অথবা পুরুষের যে কোন একটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই তাদের মাঝে বেশি থাকবে, আর সেটার উপরে ভিত্তি করেই তারা নারী অথবা পুরুষের যে কোনো শরিয়াহ এর উপরে চলবে। কারণ মহান আল্লাহর শরিয়াহ-এর বাহিরে মানব-জাতির কেউ থাকতে পারেনা। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيْرِ حَتّٰى يَكْبَرَ وَعَنْ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتّٰى يَبْرَأَ.

"'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং পাগল, যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা সুস্থ হয়। অধস্তন রাবী আবূ বক্‌র (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বর্ণনায় আছে, বেহুঁশ ব্যক্তি যতক্ষণ না সে হুঁশ ফিরে পায়।"[১২৮]

একজন মানুষ বালেগ হয়ে গেলে তাকে অবশ্যই শরীয়াহ অনুযায়ী হুকুম, আহকাম, বিধিবিধানগুলো পরিপূর্ণ মেনে চলতে হবে। ইসলামে বালেগ হওয়ার একটি মৌলিক নিতিমালা ঠিক করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

"আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তারাও যেন অনুমতি চায় যেমনিভাবে তাদের অগ্রজরা অনুমতি চাইত। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"[১২৯]

হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) فِيْ جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِيْ فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِيْ جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِيْ. قَالَ نَافِعٌ وَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ هٰذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ. ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ يَبْلُغُ الْخَمْسَ عَشْرَةَ.

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সমর অভিযানকালে আমাকে নবী (ﷺ)-এর সামনে পেশ করা হয়। তখন আমার বয়স ছিল চৌদ্দ। কিন্তু তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন না। সামনের বছর আরেক অভিযানকালে আমাকে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। তখন আমার বয়স পনের। এই বার তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। নাফি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি এই হাদীসটি 'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয (রাহিমাহুল্লাহ)-এর নিকট বর্ণনা করি। তিনি বললেন, এই বয়সটাই হলো বালেগ ও নাবালেগের বয়সসীমা। এরপর তিনি পনের বছর বয়সের লোকদের ভাতা নিরূপণের জন্য ফরমান লিখে জারি করে দিলেন।[১৩০]

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) نَحْوَ هٰذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ أَنَّ هٰذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ. وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيْ حَدِيْثِهِ. قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْنَا بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ هٰذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ.

---

[১২৮] *ইবনু মাজাহ- ২০৪১; আন্ নাসায়ী- ৩৪৩২; আবূ দাউদ- ৪৩৯৮; আহমাদ- ২৪১৭৩, ২৪১৮২, ২৪৫৯০; দারেমী- ২২৯৬; ইরওয়াহ- ২৯৭; মিশকাত- ৩২৮৭-৩২৮৮।*

[১২৯] *সূরা আন্ নূর : ৫৯।*

[১৩০] *সুনান আত্ তিরমিযী- ই. ফা. বাং, হা. ১৩৬৫।*

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَرَوْنَ أَنَّ الْغُلَامَ إِذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ وَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْبُلُوْغُ ثَلَاثَةُ مَنَازِلَ بُلُوْغُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ الِاحْتِلَامُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنُّهُ وَلَا احْتِلَامُهُ فَالْإِنْبَاتُ يَعْنِيْ الْعَانَةَ.

ইবনু আবী ‘উমার (রাহিমাহুল্লাহ-র)... ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে এরূপভাবে ‘উমার ইবনু ‘আব্দুল ‘আযীযের বক্তব্যের উল্লেখ নেই। ইবনু ‘উয়াইনাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ-র) তার রিওয়ায়াতে উল্লেখ করেছেন যে, নাফি‘ (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, আমি এই হাদীস ‘উমার ইবনু ‘আব্দুল ‘আযীয (রাহিমাহুল্লাহ-র)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এই হলো শিশু ও যোদ্ধা হওয়ার মাঝে বয়সসীমা।[১৩১]

ইমাম আবূ ‘ঈসা (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ। এতদনুসারে আলেমগণ ‘আমল করেছেন। এ হলো সুফ্ইয়ান সাওরী, ইবনু মুবারক, শাফি‘য়ী, আহমাদ ও ইসহাক (রাহিমাহুল্লাহ-র)-এর অভিমত। তাদের রায় হলো, কোনো বালকের বয়স পনের বছর পূর্ণ হলে তাকে পুরুষ বলে গণ্য করা হবে। আর পনের বছরের পূর্বে যদি স্বপ্নদোষ হয় তবেও তাকে পুরুষ বলে গণ্য করা হবে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, সাবালকত্বের বিষয় তিনটি : পনের বছর বয়স হওয়া অথবা স্বপ্নদোষ হওয়া, যদি বয়স চেনা না যায় বা স্বপ্নদোষও না হয় তবে এর পরিচয় হলো নাভির নীচে চুল উঠা। অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ﷺ) يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيْلُهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيْلِيْ.

“আত্বিয়্যাহ্ কুরাযী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরায়যা যুদ্ধের সময় আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে পেশ করা হলো। তিনি যাদের যৌন লোম উদগত হয়েছিল তিনি তাদের হত্যা করলেন আর যাদের যৌন লোম উদগত হয়নি তাদের ছেড়ে দিলেন। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম যাদের যৌন লোম উদগত হয়নি। সুতরাং আমার পথে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।”[১৩২]

অর্থাৎ- নাভীর নিচে লোম গজানো হচ্ছে বালেগ হওয়ার মাপকাঠি, অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) : تَزَوَّجَنِيْ وَأَنَا بِنْتُ سَبْعٍ أَوْ سِتٍّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ أَتَيْنَ نِسْوَةٌ، وَقَالَ بِشْرٌ : فَأَتَتْنِيْ أُمُّ رُوْمَانَ، وَأَنَا عَلٰى أُرْجُوْحَةٍ، فَذَهَبْنَ بِيْ، وَهَيَّأْنَنِيْ، وَصَنَعْنَنِيْ، فَأُتِيَ بِيْ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ)، فَبَنٰى بِيْ وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ، فَوَقَفَتْ بِيْ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ : هِيْهْ هِيْهْ، قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ : أَيْ تَنَفَّسْتُ، فَأُدْخِلْتُ بَيْتًا فَإِذَا فِيْهِ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، دَخَلَ حَدِيْثُ أَحَدِهِمَا فِيْ الْآخَرِ.

“আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ছয় অথবা সাত বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বিয়ে করেন। আমরা মদীনায় আগমন করলে একদল মহিলা আসলেন। বর্ণনাকারী বিশরের বর্ণনায় রয়েছে, আমার নিকট (আমার মা) উম্মু রূমান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আসলেন, তখন আমি দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন, আমাকে প্রস্তুত করলেন এবং পোশাক পরিয়ে সাজালেন। অতঃপর আমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট পেশ করা হলো। তিনি আমার সঙ্গে বাসর যাপন করলেন, তখন অমার বয়স নয় বছর। মা আমাকে ঘরের দরজায় দাঁড় করালেন এবং আমি উচ্চহাসি দিলাম। ইমাম আবূ দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, অর্থাৎ- আমার মাসিক ঋতু হয়েছে। আমাকে একটি ঘরে প্রবেশ করানো হলো। তাতে আনসার গোত্রের একদল মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তারা আমার জন্য কল্যাণ ও বরকত কামনা করলেন।[১৩৩]

অর্থাৎ- মেয়েদের ঋতুস্রাব বা মাসিক শুরু হলেই তারা বালেগ বলে গণ্য হবে, অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِيْ الْمَضَاجِعِ".

[১৩১] *বুখারী- হা. ২৬৬৪, ৬/৩০; আত্ তিরমিযী- হা. ১৩৬১।*

[১৩২] *সুনান আত্ তিরমিযী- ই. ফা. বাং, হা. ১৫৯০; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৫৪১; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ১৫৮৪।*

[১৩৩] *সুনান আবূ দাউদ- তাহ্ক্বীক্বকৃত, হা. ৪৯৩৩।*

"'আম্র ইবনু শু'আয়েব (রাহিমাহুল্লাহ-র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদেরকে মারপিট কর এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে।"[১৩৪]

অর্থাৎ- ছেলে মেয়েদেরকে সাত বছর বয়সে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে হবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের বিছানা পৃথক করে দিতে হবে। অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَلَغَ بَعْضُ وَلَدِهِ الْحُلُمَ عَزَلَهُ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ إِلا بِإِذْنٍ.

"ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তার কোনো সন্তান বালেগ হলেই তিনি তাঁকে পৃথক (বিছানা) করে দিতেন। সে অনুমতি ব্যতীত তার নিকট প্রবেশ করতে পারতো না।"[১৩৫]

হিজড়ারা ওয়ারিসি সম্পত্তি কিভাবে পাবে তার দিকনির্দেশনা দেয়া আছে। যেমন- হাদীসে এসেছে,

دَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْخُنْثَى قَالَ يُوَرَّثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ.

"শা'বী (রাহিমাহুল্লাহ-র) থেকে বর্ণিত, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উভয় লিঙ্গ (হিজড়া) ব্যক্তির মীরাস সম্পর্কে বলেন, সে যে অঙ্গটি দিয়ে পেশাব করে, সে অনুযায়ী সে মীরাস পাবে।"[১৩৬]

এবং কি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জামানায় হিজড়ারা সালাত আদায় করতো এই সংক্রান্ত হাদীস পাওয়া যায়। যেমন- হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : مَا بَالُ هَذَا؟ فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيْعِ، فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ : إِنِّيْ نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ قَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ : وَالنَّقِيْعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِيْنَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيْعِ.

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। কোনো একদিন এক হিজড়াকে নবী (ﷺ)-এর নিকট আনা হলো। তার হাত-পা মেহেদী দ্বারা রাঙ্গানো ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এর এ অবস্থা কেন? বলা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! সে নারীর বেশ ধরেছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে আন-নকী নামক স্থানে নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি বললেন, সালাত আদায়কারীকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আবূ উসামাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ-র) বলেন, আন-নাফী' হলো মদীনার প্রান্তবর্তী একটি জনপদ, এটা বাকী নয়।"[১৩৭]

অর্থাৎ- উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে যেই হিজড়া উপস্থিত হয়েছিল সে হয়তো ছেলে হিসেবে জন্ম লাভ করেছিল কিন্তু সে মেয়েদের বৈশিষ্ট্য (হাত-পা মেহেদী দ্বারা রাঙ্গানো) ধারণ করার ফলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার বিষয়টিকে অপছন্দ করেছিলেন এবং তাকে নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখানে আরেকটি মজার ব্যাপার হলো সেই হিজড়া সালাত আদায় করতো যার ফলে তাকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। হিজড়া সম্পর্কে আরো কিছু বর্ণনা আমরা দেখবো। যেমন- হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) لَعَنَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ : أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ وَأَخْرِجُوْا فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْنِيْ الْمُخَنَّثِيْنَ.

"ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। নবী (ﷺ) অভিশাপ দিয়েছেন পুরুষ ও নারী হিজড়াকে যারা পুরুষ সাজে। তিনি (ﷺ) বলেছেন, তোমরা এদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দাও এবং অমুক অমুক হিজড়াকে বের করো।"[১৩৮]

অর্থাৎ- পুরুষের বৈশিষ্ট্যধারী হিজড়া মহিলা সাজলে এবং মহিলার বৈশিষ্ট্যধারী হিজড়া পুরুষ সাজলে তার উপর লানত করেছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাদেরকে তিরস্কার

[১৩৪] *সুনান আবূ দাউদ- ই. ফা. বাং, হা. ৪৯৫।*
[১৩৫] *আল-আদাবুল মুফরাদ- হা. ১০৬৮।*
[১৩৬] *আদ্ দারেমী- হাদীসবিডি, হা. ৩০০৯, য'ঈফ; আল মুসান্নাফ- আব্দুর রাযযাক, ১৯২০৪; সা'ঈদ ইবনু মানসূর- হা. ১২৬; ইবনু আবী শাইবাহ্- ১১/৩৪৯, হা. ১১৪১০।*
[১৩৭] *সুনান আবূ দাউদ- তাহ্ক্বীক্বকৃত, হা. ৪৯২৮।*
[১৩৮] *সুনান আবূ দাউদ- তাহ্ক্বীক্বকৃত, হা. ৪৯৩০।*

করেছেন। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হিজড়াকে নির্বাসন দেয়ার নির্দেশ দিলে তখন সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি বললেন, সালাত আদায়কারীকে হত্যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তাকে নির্বাসন দিলেন এবং খাবারের জন্য আসার অনুমতি দিলেন। যেমন- হাদীসে এসেছে,

عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ إِذًا يَمُوْتُ مِنَ الْجُوْعِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلَ ثُمَّ يَرْجِعَ.

"আওযাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (যখন সে হিজড়াকে শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়), তখন বলা হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো না খেয়ে মারা যাবে। তখন তিনি তাকে সপ্তাহে দু'দিন শহরে আসার অনুমতি দেন, যাতে চেয়ে নিয়ে ফিরে যেতে পারে।"[১৩৯]

উপরন্তু দেখা যায়, আমাদের ভারতবর্ষের হিজড়ারা হয় হিংস্র, তারা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদাবাজি করে, রাস্তায় রাস্তায় মানুষকে অপদস্ত ও জুলুম করে টাকা পয়সা তুলে। যা ইসলামী শরীয়াহ-এর দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত। অথচ চাইলেই তারা এই গর্হিত পন্থা পরিত্যাগ করে শিক্ষা-দীক্ষা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা অর্জন করে কাজ কর্ম করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এবং কি এরা চাইলেই গারমেন্টস বা সেলাই কাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা বা শারীরিক শ্রম বিনিয়োগ করেও জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, কেননা এদের মাঝে অনেকেই শুঠাম দেহের অধিকারী যারা কায়িক শ্রমের সামর্থ্য রাখে। আমাদেরকে এই অপকালচার থেকে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা প্রচেষ্টা করতে হবে এবং তাদেরকেও এই অপকালচার থেকে বেরিয়ে এসে সুন্দর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে। অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ﷺ) مُخَنَّثٌ فَكَانُوْا يَعُدُّوْنَهُ مِنْ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ - قَالَ - فَدَخَلَ النَّبِيُّ (ﷺ) يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) "أَلاَ أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ". قَالَتْ فَحَجَبُوْهُ.

"'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক হিজড়া নবী (ﷺ)-এর স্ত্রীগণের কাছে প্রবেশ করত। লোকেরা তাকে যৌন কামনা রহিত (অনভিজ্ঞ)-দের অন্তর্ভুক্ত মনে করত। রাবী বলেন, নবী (ﷺ) একটি ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন সে তাঁর কোনো স্ত্রীর কাছে ছিল আর সে এক নারীর (দেহ সৌষ্ঠবের) বিবরণ দিয়ে বলছিল, যখন সামনে এগিয়ে আসে তখন চার (ভাঁজ) নিয়ে এগিয়ে আসে এবং যখন ফিরে, তখন আটটি নিয়ে ফিরে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এ তো দেখছি এখানকার (নারী রহস্যের) বিষয়াদি বুঝে শুনে। সে যেন তোমাদের কাছে কখনো প্রবেশ না করে। তিনি ['আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)] বলেন, এরপর তারা তার থেকে পর্দা করতেন।"[১৪০]

হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى الله عنهما) قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ (ﷺ) الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ "أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ". وَأَخْرَجَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.

"ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) লানত করেছেন নারীরূপী পুরুষ ও পুরুষরূপী নারীদের উপর এবং বলেছেন, তাদেরকে বের করে দাও তোমাদের ঘর হতে এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন।"[১৪১]

অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ (ﷺ) الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ "أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ". قَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ (ﷺ) فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.

"ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) পুরুষ হিজড়াদের উপর এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদের উপর লানত করেছেন। তিনি বলেছেন, ওদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, নবী (ﷺ) অমুককে বের করেছেন এবং 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অমুককে বের করে দিয়েছেন।"[১৪২]

[চলবে ইন্শা-আল্লাহ]

[১৩৯] *সুনান আবূ দাঊদ- ই. ফা. বাং, হা. ৪০৬৪।*

[১৪০] *সহীহ মুসলিম- ই. ফা. বাং, হা. ৫৫০৩।*
[১৪১] *সহীহুল বুখারী- ই. ফা. বাং, হা. ৬৩৭৩।*
[১৪২] *সহীহুল বুখারী- ই. ফা. বাং, হা. ৫৪৬৬।*

নিভৃত ভাবনা

শান্তি ও মানবতার ধর্ম ইসলাম

–মো. কায়ছার আলী*

পড়ো! তোমার প্রভুর নামে। পবিত্র আল কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত বাণী নামায কায়েমের কথা নয়, যাকাত আদায়ের তাগিদ নয়, ঈমান আনার নির্দেশ নয়, সিয়াম সাধনার বাণী নয়, হজ্জব্রত পালনের উক্তি নয়, পর্দার হুকুম নয়, জিহাদের ঘোষনা নয়, তাক্বওয়া অর্জনের উপদেশ নয়, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধও নয়। ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রথমে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কুরআন যেখানে জ্ঞান অর্জনের চর্চার কথা বলা হয়েছে। সেখানে দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যায় পৃথিবীতে সবচেয়ে কম লেখাপড়া করে আজ মুসলমানেরা। কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন থেকে আমরা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছি। কেন মুসলমানেরা জ্ঞান অর্জন করে না তা আমাদের ভাবতে হবে। ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম। সকল মানুষের সাথে সুখ শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম হোক সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশে। শোষণ ও নির্যাতন চিরতরে দূরীভূত হোক এটা ইসলামের শিক্ষা। আজ সারা বিশ্বে একতরফাভাবে মিথ্যা অপবাদ ও গালি দেওয়া হচ্ছে ফাঁদ পেতে বা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। মুসলমানেরা একে অপরের সাথে দেখা বা সাক্ষাত হলে প্রথমেই শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সালামের মাধ্যমে অর্থাৎ- একে অপরের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করে। মোয়াজ্জিমের সুমধুর, সুললিত লালিত্যময়, জলদ গম্ভীর আযানের ধ্বনি শুনে মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার পর তা শেষ করে ডানে ও বামে সালাম (শান্তি) প্রতিষ্ঠা ঘোষণার মাধ্যমে। মোনাজাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে প্রথমে দুনিয়া ও পরে আখিরাতের মুক্তির মাধ্যমে। শুধু জীবিত মানুষদেরই জন্য নয় মৃত ব্যক্তিদের জন্য কবরস্থান জিয়ারত করতে গিয়েও মৃত ব্যক্তিদের প্রথমে সালাম প্রদান করা হয়। কি গভীর শিক্ষা ইসলামের।

মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিষ্ঠা করাই হলো ঈমানদার বা নবী (ﷺ)-এর অনুসারীদের পবিত্র কাজ। মানুষ কেন নিজেকে ধ্বংস করবে, সমাজের ক্ষতি করবে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে। মানুষের জন্মের পূর্ব থেকেই পিতা-মাতাই আর্থিক ব্যয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য তার উপর বর্তায়। এই ঋণ তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শোধ করতে হবে। নিজেকে ধ্বংস করে নয়। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর। ১,০০০ জন সশস্ত্র যোদ্ধার বিপক্ষে অস্ত্রহীন, ক্ষুধা ও দারিদ্রতায় জর্জরিত রোযাদার মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী, যাকে অসম যুদ্ধ বলা যায়। মক্কা থেকে কুরাইশগণ তথা ইসলাম বিরোধী শক্তি ৩২০ কি.মি. উত্তরে যুদ্ধ করার জন্য বদর প্রান্তরে আর অন্য দিকে মহানবী (ﷺ)-এর নেতৃত্বে মদীনা থেকে ১২২ কি.মি. দক্ষিণে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করার জন্য বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়। আবূ জেহেলের বাহিনী ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করার জন্য বেশি পথ অতিক্রম করে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলাম কাউকে প্রথমে আঘাত করে না, প্রত্যাঘাত করে, বাধ্য হয়ে প্রতিরোধ করে। বদরের রাত এক সাহাবী রেকি করছেন, প্রতিপক্ষের অবস্থান ও গতিবিধি জানার জন্য, এটা যুদ্ধের কৌশল। সেই সাহাবী ফিরে এসে মহানবী (ﷺ) কে বলছেন, "হুজুর (ﷺ), আমি আবূ জেহেলকে একা এবং সঙ্গী ছাড়া ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছিলাম। কিন্তু ইস্! কেন যে তাকে হত্যা করলাম না। এই সুযোগ আর হয়তো জীবনে পাবো না। নবী (ﷺ) বলেন, তুমি যদি নিরস্ত্র, একাকী ঘুমন্ত আবূ জেহেলকে হত্যা করতে, তাহলে তুমি জাহান্নামী হতে। এই ঘটনা থেকে বুঝা যায়, ইসলাম কখনও চোরাগুপ্তা, আকস্মিক, পিছন থেকে কাপুরোষিচিত হত্যা পছন্দ করে না। তাহলে কার স্বার্থে পৃথিবীতে জিহাদের নামে সন্ত্রাস হচ্ছে। সেটা আমাদের ভাবতে হবে। ইসলামকে পরোক্ষভাবে দোষারোপ করা হচ্ছে। বিদেশী এক সাংবাদিক কথার ফাঁদে বা জালে জোড়ানোর জন্য আমেরিকার এক মুসলমানকে প্রশ্ন করেন, লাদেন কি মুসলমান? আমেরিকান বললেন, হ্যাঁ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, লাদেন তো সন্ত্রাসী, তাহলে আপনার উত্তরমতে, মুসলমানরা সন্ত্রাসী। ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয় ছিল সমগ্র আরব বিজয়ের সমতুল্য। পৃথিবীতে কোন দেশ বিনা রক্তপাতে জয় হয়নি। সীজার,

* *লেখক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।*

আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ানের দেশজয়, নিরীহ জনসাধারণের সাথে রক্তপাতের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। কিন্তু নবী (ﷺ) বিনা প্রতিবন্ধকতায় বা বিনা বাধায় মক্কা বিজয় করেন। মক্কার দক্ষিণ ফটকে কিছু কোরাইশ বিক্ষিপ্তভাবে বাধা দিলে ২৩/২৪ জন কোরাইশ নিহত হন এবং মুসলমানদের পক্ষে বানু খোজা গোত্রের দুই ব্যক্তি প্রাণ হারায়। মক্কা বিজয়ের আগে মহানবী (ﷺ) কয়েক শ্রেণির লোককে নিরাপত্তার ঘোষণা দেন। মক্কা বিজয় কোনো প্রকার লুটতরাজ, গৃহ লুণ্ঠিত, শ্লীলতাহানি, অত্যাচার, নিপীড়ন বা নির্যাতন হয়নি। মানবতার নবী (ﷺ)-এর মহানুভবতা সত্যি প্রশংসনীয়। Plain Muth Statistics (১৯৩৪-৮৪)-এর সূত্র মতে, ৫০ বছরে সারা পৃথিবীতে মুসলমান বৃদ্ধির হার ২৩৫% আর খ্রিষ্টান বৃদ্ধির হার মাত্র ৪৭%। এই সময়ের মধ্যে পাঠকেরা কি বলতে পারবেন পৃথিবীতে কোথাও ধর্মীয় যুদ্ধ হয়েছে। ১৪০০ বছর ধরে আরব বিশ্বে এবং প্রায় ১০০০ বছর ভারতে মুসলমানেরা শাসন করেছে। পরে আরবে ব্রিটিশ ও ফ্রান্সরা আগমন করে। আরব বিশ্বে বংশ পরম্পরায় দেড় কোটি কপটিক খ্রিষ্টান কি বলতে পারবেন, মুসলমানরা সন্ত্রাসী। ভারতে ৮০% অমুসলমানরা সাক্ষী দেয় মুসলমানরা তরবারি দিয়ে তাদের ধর্ম প্রচার করেননি বা তাদের উপর আক্রমণ করেননি। ভারতের বৃক্ষ, পাতা, পল্লব, দেওয়ানি খাস, আম ও তাজমহল বানিয়ে ভারতকে মুসলমানেরা সাজিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী বা রাজীব গান্ধীর হত্যার সঙ্গে মুসলমানরা জড়িত নয়। জেরুজালেমকে নিয়ে মুসলিম মহাবীর সালাউদ্দিন আইয়ুবির সাথে ফ্রান্সের সৈন্য বাহিনীর যুদ্ধ হয়েছে কয়েকবার। যাকে ক্রুসেড বলে। মুসলমানেরা সবশেষে জিতলেও প্রতিপক্ষের সাথে কোনো অমানবিক আচরণ করেননি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর বালাফোরের সহযোগিতায় মধ্যপ্রাচ্যে ইয়াহূদী রাষ্ট্র গঠনের পর ইসলাম বিরোধী শক্তি ১৯৭৯ সালে ইরানের সফল অভ্যুত্থানের পর ইরাক দিয়ে ইরানের বিপক্ষে যুদ্ধ বাধিয়ে দীর্ঘদিনের গভীর ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করেন। ইসলামী দেশগুলোকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখা আর অন্য দিকে তলে তলে অস্ত্র বিক্রি করা এবং মধ্যপ্রাচ্যে তেল সম্পদ হস্তগত করার জন্য অনেক কুটকৌশল কাজে লাগিয়েছে। সারা বিশ্বে আজ সন্ত্রাসী হামলার বিস্তার ঘটছে। আফ্রিকা মহাদেশের ২৯টি দেশে যুদ্ধ, ২৬৭টি বিদ্রোহী দল নানা দাবিতে লড়াই করছে। ইউরোপের ১০টি দেশে ৮০টি বেসামরিক বাহিনী আছে। এশিয়ার ১৬টি দেশে সক্রিয় ১৬৪ বিদ্রোহী বেসামরিক দল। জানুয়ারি ১৬ থেকে জুন ১৬ এই সময়ের মধ্যে ৬৭১টি সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে পৃথিবীতে। ইরাকে একদিনে ২৬০জন লোকের শিরচ্ছেদ করা হয়েছে। আমাদের দেশেও পহেলা জুলাই ১৬ হোটেল আর্টিজনে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। মানুষ হত্যার পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে, ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে।"

মহানবী (ﷺ) বলেছেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি একজন মু'মিনকে হত্যা করা অবশ্যই মহান আল্লাহর নিকট দুনিয়া লয় হয়ে যাওয়ার চাইতেও অধিক ভয়ঙ্কর।"

নবী (ﷺ) মক্কা বিজয়ের আগের রাত্রে নিরস্ত্র অবস্থায় ধরা পড়ার পরেও শীর্ষ কাফির নেতা আবূ সুফিয়ানকে হত্যা করেননি; বরং তিনি তাকে মুসলিম হওয়ার সুযোগ দেন। মক্কা বিজয়ের পরের দিন প্রদত্ত ভাষণে তিনি সকল কাফির মুশরিকক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং রক্তপাতকে স্থায়ীভাবে হারাম করে দেন। ফলে সবাই ইসলাম কবুল করে ধন্য হন। আজ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের পাশাপাশি, নারীর মর্যাদা, মানবিকতা, সহমর্মিতা, দানশীলতা, পরার্থপরতা, ন্যায়বিচার ন্যায়প্রতিষ্ঠা, সহযোগিতা, দাস প্রথা উচ্ছেদ, সাদা-কালোর মৈত্রী স্থাপন করে বিদায় হজ্জের ভাষণের বাণীগুলো কিভাবে সর্বত্র বাস্তবায়ন করা যায় তা জানাতে হবে। নবী, সাহাবী, খলিফাদের, ইসলামী মনীষী বা শাসকদের জীবনে ঘটে যাওয়া এরকম শত শত ইতিহাস আমাদের লেখনীর মাধ্যমে পাঠ্য বইয়ে লিপিবদ্ধ করতে হবে। মানুষ হত্যার মোহে যারা নিমজ্জিত এরকম ভ্রান্ত ধারণা বাদীদেরকে ইসলামের সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য আলেম সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রবাদে আছে– "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।" তাই সকলকে বেশি বেশি করে ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জিহাদ এবং সন্ত্রাস, শহীদ এবং আত্মঘাতী (আত্মহত্যা) এক নয়। ❑

স্বাস্থ্য সচেতনতা

যে কারণে জাপানি শিশুরা সবচেয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী

জাপানিদের গড় আয়ু ৮৪ বছরের বেশি। দীর্ঘ জীবনে তাঁদের স্বাস্থ্য থাকে অটুট। শৈশব থেকেই তাঁরা আদতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। বলা হয়, জাপানি শিশুরা দুনিয়ার সবচেয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। এর পেছনের রহস্য কী?

খাদ্যতালিকায় তৃপ্তিদায়ক ও পুষ্টিকর খাবার রাখা : জাপানি খাবার সাধারণত পুষ্টিকর; তৃপ্তিদায়কও বটে। পুষ্টিকর খাবার পেটভরে খেলে পরে 'জাঙ্ক ফুড' খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর থাকে না। তাই বলে আমাদের শিশুদের স্বাস্থ্যবান করে তুলতে জাপানি সিউইড, সুশি বা তোফুই যে খাওয়াতে হবে, তা নয়; দেশি পুষ্টিকর খাবার খাওয়ালেই চলবে। উদ্ভিজ্জ খাবার, যেমন- ফলমূল, শাকসবজি, শস্যদানা ও উপকারী চর্বি (এ ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের জন্য উপকারী ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ মাছ) বেশি খাওয়াতে হবে। শিশুর খাদ্যতালিকায় কম লবণ ও চিনিযুক্ত খাবার রাখুন। এসব উদ্ভিজ্জ খাবার স্থূলতা এবং তা থেকে সৃষ্টি হওয়া রোগবালাইয়ের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করে।

খাওয়া ও সংযম উভয়ই উপভোগ করতে শেখানো : শিশুকে 'ট্রিট' গ্রহণ করার অনুমতি দিন। এ ব্যাপারে অনুমতি না দিয়ে কঠোর হয়ে তাকে অসামাজিক বানাবেন না। অনুমতি দেওয়ার সঙ্গে মুখরোচক খাবার উপভোগ করতে শেখান। তবে খাওয়ার সময় আপনার শিশুর মধ্যে সংযমবোধও যেন থাকে, সেদিকে তাকে নজর রাখতে বলুন। পশ্চিমাদের তুলনায় জাপানিরা স্ন্যাকস বা ভাজাপোড়া খুবই কম খায়। এ ক্ষেত্রে তারা মেনে চলে কঠোর পরিমিতবোধ। এছাড়া সাংসারিক বা পেশাগত কাজে যত ব্যস্তই থাকুন না কেন, দিনে অন্তত একবার আপনার শিশুর সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। খাওয়ার সময় শিশুকে দেখান কীভাবে আপনি খাবারটি বেশ উপভোগ করছেন এবং তা কতটা সুস্বাদু হয়েছে। এতে শিশু যেকোনো খাবার উপভোগ করে খাওয়া এবং সংযম বা পরিমিতবোধের চর্চাও শিখবে। জাপানিরা ঠিক এটাই করেন।

ভিন্ন রকমের খাবার খেয়ে দেখতে শেখানো : শিশুকে নতুন নতুন খাবারের স্বাদ নিতে দিন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের বেলায় শিশুর পছন্দ-অপছন্দের তালিকা বদলে যায়। এ কারণে স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি তাদের আগ্রহ তৈরি করানো বাবা-মায়েদের জন্য সহজ হয়। ছোট থেকেই ভিন্ন রকম খাবারের স্বাদ নিতে পারলে শিশু পরবর্তী জীবনে নিজের ডায়েটের সময় সঠিক খাদ্যতালিকা ঠিক করতে পারবে।

খাবার ছোট ছোট প্লেটে পরিবেশন করা : জাপানে শিশুদের সামনে খাবার দেওয়া হয় ছোট ছোট প্লেটে। ১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার ব্যাসের প্লেটে ভাত এবং ২ দশমিক ৫ থেকে ৭ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার ব্যাসের বাটিতে ডাল, শাকসবজি বা তরকারি পরিবেশন করতে পারলে সবচেয়ে ভালো। যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার টেম্পল ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর ওবেসিটি রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশনের গবেষক জেনিফার অরলেট ফিশারের গবেষণা বলছে, এতে শিশুদের খিদে এবং গৃহীত খাবারের পরিমাণের মধ্যে ভালো সমন্বয় ঘটে। আপনার শিশুর খাবারও তাই ছোট ছোট প্লেট বা বাটিতে পরিবেশন করুন। তবে পরিমিতিবোধ পালন করতে গিয়ে যেন আবার প্রয়োজনীয় ফলমূল, শাকসবজি বাদ না পড়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে ভুলবেন না। দিনে অন্তত এক ঘণ্টা বাইরে গিয়ে খেলাধুলা বা দৌড়ঝাঁপ করলে শিশুরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। *[উইকিমিডিয়া কমনস]*

পর্যাপ্ত দৌড়ঝাঁপ করতে দেওয়া : ভিডিও গেম বা মুঠোফোনের আসক্তি থেকে শিশুদের দূরে রাখা খুবই দুরূহ কাজ। তারপরও দিনে অন্তত এক ঘণ্টা বাইরে গিয়ে খেলাধুলা বা দৌড়ঝাঁপ করলে শিশুরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। আপনার শিশুকে তাই ঘরের বাইরে, মাঠে খেলাধুলা করার জন্য উৎসাহ দিন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে– ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সীদের পর্যাপ্ত কায়িক শ্রম দরকার। এতে তাদের পেশি ও হাড় দৃঢ় ও মজবুত হয়।

খাবার তৈরি ও পরিবেশনে শিশুকে অংশগ্রহণ করানো : অ্যাপেটাইট জার্নালে প্রকাশিত ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুদের ওপর করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাবার তৈরির প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশ নিতে দিলে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য ও ডায়েটের প্রতি বেশ মনোযোগী হয়ে ওঠে। তাই খাবার তৈরি এবং তা পরিবেশনের কাজে আপনার শিশুকেও নিয়োজিত করুন। জাপানিরা এটা নিয়মিতই করেন। এছাড়া পরিবারের সবাই একসঙ্গে খাবার খান। ২০১৪ সালের নভেম্বরে পেডিয়াট্রিকস জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণা বলছে, খাবার টেবিলে পরিবারের বড়দের উপস্থিতি শিশুদের বেশ উৎসাহিত করে। এতে শিশুরা শৈশবকালীন স্থূলতার ঝুঁকি থেকেও রক্ষা পায়। আর এতে যে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয় এবং শিশুরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, তা বলা বাহুল্য।

স্বাস্থ্যকর ও সুষম খাবার তৈরির প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশ নিতে দিলে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য ও ডায়েটের প্রতি বেশ মনোযোগী হয়ে ওঠে।

কিছু জায়গায় কর্তৃত্বপূর্ণ হওয়া : কেউ কেউ সন্তানের ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে অস্বস্তিতে ভোগেন। কিন্তু যখন তাদের খাবার এবং জীবনযাপনের ব্যাপার চলে আসে, তখন কর্তৃত্বের চর্চা না করে উপায় নেই। জাপানি বাবা-মায়েরা সন্তানের ওপর কর্তৃত্ববাদী আচরণের চেয়ে কর্তৃত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে অভিভাবকত্বের প্রয়োগ করতে বেশি পছন্দ করেন। প্রশ্ন হলো– এই কর্তৃত্বপূর্ণ অভিভাবকত্ব আবার কী? সহজ কথায় বললে 'আমি বলেছি, তাই তোমাকে করতে হবে' বা এ-জাতীয় বাক্য প্রয়োগ না করে শিশুকে কিছু করতে বলা। তবে কর্তৃত্বপূর্ণ অভিভাবকত্ব প্রয়োগে মা-বাবা হিসেবে আপনাকে আগে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। যেমন- সরাসরি 'না' বা 'হ্যাঁ' বলেও কোনো কিছু শেখানো যায়। আবার শিশু ভুল করলে শাস্তি না দিয়ে তার পাশে থাকা এবং পরে বিষয়টি বোঝানো। এই নিয়ম শিশুর জন্য এমন একটা পরিবেশ তৈরি করে, যা তাদের সুষ্ঠু খাদ্যাভ্যাসে অনুপ্রাণিত করে। *[সূত্র : প্রথম আলো (রিডার্স ডাইজেস্ট)]*

মানবদেহে চর্বি জমার কারণ ও প্রতিকার

মানবদেহে চর্বি জমা হতে হতে মানুষের ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে, মেদভুঁড়ি দেখা দেয়, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কায়িক শ্রম সম্পাদনের যোগ্যতা কমে যায়। কায়িক শ্রম না করার ফলে ব্যক্তি আরও বেশি মোটাসোটা হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে মানুষ এক ধরনের দুষ্টচক্রে পড়ে আরও বেশি মোটা ও স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পতিত হয়।

ভরপেট খাওয়ার পরে আলস্য এসে ভর করে। আর খাওয়ার পরেই যারা ভাতঘুমে যান, তাদের পেটে চর্বি জমার প্রবণতা থাকে সব থেকে বেশি। দীর্ঘক্ষণ বসে যারা কাজ করেন, তাদের পেটেও ধীরে ধীরে চর্বি জমে যায়। বাড়তি চর্বি শুধু সৌন্দর্যকেই ম্লান করে দেয় না, সেই সঙ্গে নানা রোগও ডেকে আনে।

শরীরে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকলে হাত, মুখ, পেট এবং উরু এই যায়গাগুলোতেই বেশি জমে। বাড়তি চর্বি জমে যাওয়ার আগেই সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আর চর্বি যদি জমেই যায়, নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস আর ব্যায়ামে সেটিকে অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে। কোন কারণে চর্বি জমছে, এই কারণটিকে চিহ্নিত করে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে।

পেটে চর্বি জমার কারণ :

* যারা শর্করাসমৃদ্ধ খাবার বেশি খান, তাদের পেটে দ্রুত চর্বি জমে। ভাত, পোলাও, বিরিয়ানি, পরোটা, লুচি, মিষ্টি, কোমল পানীয় খাওয়ায় বিধিনিষেধ মানতে হবে।
* যারা খাওয়ার পরে দ্রুতই ঘুমিয়ে যান, তাদের খাবার পরিপাক হয় না ঠিকমতো। সঞ্চিত শক্তি খরচও হয় না। ফলে এটাও চর্বি জমার খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ।
* যাদের সারাদিনের কাজ চেয়ার-টেবিলেই এবং শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় না, তাদের পেটেও দ্রুত চর্বি জমে।
* মাখন, পনির, ঘিয়ের মতো চর্বিযুক্ত খাবারে যারা অভ্যস্ত এবং যারা ফাস্টফুডের ভক্ত, তাদের পেটেও চর্বি জমে সহজেই।

পেটে চর্বির জন্য যেসব রোগ দেখা দেয় :

* পেটে বাড়তি চর্বি জমলে রোগব্যাধিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাড়তি চর্বির ফলে পরিশ্রমে অনাগ্রহ জন্মে। ফলে চর্বি জমার হারটাও বাড়ে।
* স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আ ফ ম হেলাল উদ্দীন বলেন, পেটে অতিরিক্ত চর্বি জমলে লিভারের বিভিন্ন রোগসহ ফ্যাটি লিভারের শঙ্কা বাড়ে, অর্থাৎ- লিভারের চারদিকে চর্বি জমে যায়, ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন রোগী, হতে পারে হার্নিয়াও।
* এছাড়া নারীর হরমোনজনিত জটিলতাসহ নানা ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে।

চর্বি কমাতে করণীয় :

* একবারে বেশি না খেয়ে বারে বারে অল্প অল্প করে খান। প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অল্প কিছু হলেও মুখে দিন।
* শর্করাজাতীয় খাবারে যদি পেট না ভরে, শাকসবজি খেয়ে ভরান। সঙ্গে খেতে পারেন যে কোনো টক ফল।
* খোসাসহ ফল বেশি করে খান। পেয়ারা, বরই, আমড়া, শসা- এসবে তৃষ্ণা মেটাতে পারেন।
* একান্তই মাংস খেতে চাইলে চর্বির অংশ বাদ দিয়ে খেতে হবে। ঝোল কিংবা আলু একদমই বাদ থাকুক।
* যে কোনো ধরনের তেলে ভাজা, ফাস্টফুড জাতীয় খাবার একদমই বর্জন করতে হবে।
* পানি খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে। পানি শরীরের মেটাবলিজম ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে চর্বি জমতে বাধা দেবে।
* পেটের চর্বি কমাতে খাবার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি করতে হবে ব্যায়ামও।
* নিয়মিত জিমে এলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করলে ফলাফলটা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। আর জিমে যাওয়া সম্ভব না হলে সাঁতার, সাইকেল চালানো, জোরে হাঁটা, দড়িলাফ- এগুলো পেটের চর্বি ঝরানোর জন্য খুব ভালো ব্যায়াম হতে পারে।
* এছাড়া লিফট ব্যবহার না করে হেঁটে ওঠা, কিংবা ফ্লাইওভারের নিচ থেকে জোরে হেঁটে ওপরের দিকে ওঠার অভ্যাস গড়লেও চর্বি ঝরবে দ্রুত। *[সূত্র : একুশে টেলিভিশন অন লাইন]*

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদ্‘আত, প্রত্যেকটি বিদ্‘আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : *আল কুরআনের বাণী– ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ “কুল্লু মান ‘আলাইহা ফা-ন”, “যমিনের ওপর যা কিছু সবই ধ্বংস হয়ে যাবে”– (সূরা আর্ রহমা-ন : ২৬)। তবে কি সিঙ্গায় ফুতকারের সাথে সাথে জান্নাত জাহান্নাম আরশ এবং অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র সবই ধ্বংস হয়ে যাবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।*

আল আমীন
সোনাতলা, বগুড়া।

জবাব : আল্লাহ তা‘আলার বাণী–

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾

অর্থ : “যমিনের ওপর যা কিছু সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।” ***(সূরা আর্ রহমা-ন : ২৬)***

এ আয়াতে মূলত যমিনের ওপর যা রয়েছে অর্থাৎ- জিন্, ইনসান, পশু-পাখি, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা অন্য আয়াতে বলেন :

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ﴾

“আর যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন আসমানসমূহ ও যমিনে যারা আছে সবাই ভীত হবে, তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন তারা ছাড়া।” ***(সূরা আল নাম্‌ল : ৮৭)***

এ আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা যাদের ধ্বংস চাইবেন না, তারা ছাড়া সবই সিঙ্গায় ফুঁতকারে ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা যাদের চাইবেন এর মধ্যে জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি যা ধ্বংস হবে না মর্মে অন্য দলিলে প্রমাণিত। –ওয়াল্লাহু তা‘আলা আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : *ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) মুহাম্মদ (ﷺ)-এর কততম উর্ধ্বতন পুরুষ এবং উভয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান কত বছর ছিল?*

ইলিয়াস হোসেন
সাভার, ঢাকা।

জবাব : মুহাম্মদ (ﷺ)-এর বিশতম পূর্বপুরুষ হলেন আদনান, এ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। এর উপরের ক্রমধারায় বিভিন্ন মতামত রয়েছে, তবে অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য এক বর্ণনায় ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ৬১(একষট্টি)তম পূর্ব পুরুষ। একইভাবে সময়ের ব্যবধান সম্পর্কেও কিছু মতামত রয়েছে। তবে কিছু গবেষক উল্লেখ করেছেন, উভয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান হলো– ২,৫২৪ (দুই হাজার পাঁচশত চব্বিশ) বছর। –ওয়াল্লাহু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (০৩) : *আমি এক বক্তার বক্তব্যে শুনেছি, সাহাবীগণ মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ঘাম শিশিতে ভরে রাখতেন এবং আতর হিসেবে ব্যবহার করতেন –এটি কি সঠিক কথা?*

ইঞ্জি. মশিউর রহমান
উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : হ্যাঁ, আপনি যা শুনেছেন তা সঠিক। সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা নবী (ﷺ) আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রিত হলেন, খাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম নিলেন, তখন ঘেমে যাচ্ছিলেন। আমার মা তখন একটি শিশিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ঘাম সংগ্রহ করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জাগ্রত হলেন এবং বললেন, হে উম্মে সুলাইম! তুমি এটা কি করছ। তিনি বলেন, আমি আপনার ঘাম সংগ্রহ করছি, আমাদের সুগন্ধিতে দেওয়ার জন্য। কারণ এটা সবচেয়ে ভালো সুগন্ধি। ***(সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৩১)***

জিজ্ঞাসা (০৪) : *মানুষ যদি জানতো, জাহান্নামের শাস্তি কতো ভয়াবহ, তাহলে সে সর্বদা ক্রন্দন করত ও জাহান্নামের ভয়ে সকল পাপ ছেড়ে দিত। আমার প্রশ্ন হলো– ইবলিস তো জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তবে সে কেন তাওবাহ্ করে না?*

জাহানারা ইসলাম
নোয়াপাড়া, যশোর।

জবাব : “মানুষ যদি জানতো, ... ছেড়ে দিত।” এটা মানুষের সাধারণ অবস্থা। এ জন্যই আদম (আলাইহিস সালাম) তাওবাহ্

করেছেন। কিন্তু ইবলিসের অবস্থাটা ব্যতিক্রম। অর্থাৎ- কিছু মানুষ আছে যারা জানার পরেও সোজা পথে চলতে চায় না। ইবলিস সে পথের পথিক। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য ইবলিসকে এ ইবলিসি করার সুযোগ দিয়েছেন। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৫) : ***আমরা পবিত্র কুরআনে ২৫জন নবীর নাম পাই। হাদীস থেকে কোনো নবীর নাম এবং নবী রাসূলের সংখ্যা জানা যায় কি?***

ইয়াসির আরাফাত
হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।

জবাব : কুরআন মাজীদে উল্লেখ হয়নি এমন কিছু নবীর নাম হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, যেমন- ইউশা' ইবনু নুন। আর নবী-রাসূলের সংখ্যা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে– এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, তন্মধ্যে রাসূলের সংখ্যা হলো তিনশত পনের জন। ***(মুসনাদ আহমাদ- হা. ২২২৮৮)***

ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ-র) মিশকা-তুল মাসা-বীহ (হা. ৫৭৩৭) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

উক্ত হাদীসের বিষয়ে কিছু মতভেদ থাকলেও রাসূলদের সংখ্যার হাদীসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ায় তা অধিক বিশুদ্ধ। ***(সিলসিলা সহীহাহ্- হা. ২৬৬৮)***

জিজ্ঞাসা (০৬) : ***বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ মতে আল্লাহ তা'আলার আকার আছে, নিরাকার নন। এ বিষয়ে ইমাম চতুষ্টয়ের মত দলিলসহ জানালে উপকৃত হব ইন্শা-আল্লাহ।***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কানসাট, নবাবগঞ্জ।

জবাব : প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিরাকার এর মূল বিষয় হলো– কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহ যথাযথ সাব্যস্ত না করা। অপব্যাখ্যা, বিকৃতি ও অস্বীকার করা। এ ক্ষেত্রে সঠিক 'আক্বীদাহ্ হলো আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নাম ও গুণাবলী তথা সিফাতসমূহ যেভাবে কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসে এসেছে, কোনো অপব্যাখ্যা, বিকৃতি ও অস্বীকৃতি এবং সাদৃশ্য স্থাপন ছাড়াই মহান আল্লাহর জন্য যে রূপ শোভা পায় সেরূপ বিশ্বাস করা। এটাই সালাফদের 'আক্বীদাহ্। আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 'আক্বীদাহ্। এ 'আক্বীদাই ছিল প্রসিদ্ধ চার ইমাম-তথা ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম মালিক, ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ-র)'র। প্রসিদ্ধ গবেষক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আল খুমাইস স্বীয় গ্রন্থ اعتقاد الأئمة الأربعة অর্থাৎ- চার ইমামের 'আক্বীদাহ্ এতে বিস্তারিত দলিলসহ আলোচনা করেন। তিনি বলেন :

اعتقاد الأئمة الأربعة - أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد (رحمهم الله) - هو ما نطق به الكتاب والسُّنَّة وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وليس بين هؤلاء الأئمة ولله الحمد نزاع في أصول الدين بل هم متفقون على الإيمان بصفات الرب وأن القرآن كلام الله غير مخلوق،...

প্রসিদ্ধ চার ইমাম– আবূ হানীফাহ্, মালিক, শাফে'য়ী ও আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ-র)'র 'আক্বীদাহ্ যা কুরআন ও সুন্নাহ বলে। যার উপর সাহাবী ও তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণ ছিলেন। মহান আল্লাহর প্রশংসা যে, উক্ত চার ইমামের মাঝে ইসলামের মৌলিক বিষয়ে কোনো বিতর্ক ছিল না। মহান আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীর প্রতি ঈমান এবং কুরআন মহান আল্লাহর বাণী, সৃষ্ট নয়, এ বিষয়ে তাঁরা সকলে একমত ছিলেন।... তারা কালামপন্থী যুক্তিবাদীদের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ***(ইতিকাদুল 'আয়িম্মাহ্ আল আরবাআহ- ০৫ পৃ.)***

অতএব আমরা বলতে পারি ঈমানের বিস্তারিত মাসআলায় সামান্য কিছু মতভেদ থাকলেও মহান আল্লাহর সিফাত সঠিকভাবে সাব্যস্তকরণে এবং সিফাত অস্বীকারকারী ভ্রান্তবাদিদের প্রতিবাদে প্রসিদ্ধ চার ইমাম একমত ছিলেন।

জিজ্ঞাসা (০৭) : ***আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে চাই। এই ঋণ গ্রহণ আমার জন্য বৈধ হবে কি? সঠিক সমাধান ও পরামর্শ আশা করছি।***

নাম প্রকাশে আনিচ্ছুক
পাবনা সদর, পাবনা।

জবাব : ইসলামী ব্যাংক যদি শরীয়াতসম্মত পন্থায় লাভ ও লসে অংশ নেয়ার মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে তাহলে আপনি গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু যদি শুধু নামে পরিবর্তন হয় বাস্তবে নয়, তাহলে বৈধ হবে না। অবশ্য নানামুখী প্রতিবন্ধকতার কারণে তারাও শতভাগ শরীয়ার বিধান প্রয়োগ করতে পারে না। এমতাবস্থায় বৈধ হবে না। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***আমি হজ্জের নিয়ত করেছিলাম, কিন্তু বিগত বছর থেকে রেট বৃদ্ধি পাওয়ায় হজ্জ করা এখন আমার সামর্থ্যের বাইরে। এখন যদি আমি 'উমরাহ্ করি, তবে আমার জন্য তা যথেষ্ট হবে কি?***

আবুল আব্বাস
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

জবাব : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (سورة آل عمران : ٩٧)

"বাইতুল্লাহয় পৌঁছতে সার্বিক সামর্থ্যবানের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে হজ্জ পালন করা অপরিহার্য্য।" সামর্থ্য না থাকলে অপরিহার্য্য নয়। তবে 'উমরার সামর্থ্য থাকলে 'উমরাহ্ করবেন। আবার পরবর্তিতে হজ্জের সামর্থ্য হলে হজ্জ পালন করতে হবে। এ 'উমরাহ্ যথেষ্ট হবে না। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***আমি শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি না। তবুও ভুল উচ্চারণে হলেও কষ্ট করে তিলাওয়াত করি। আমি শুনেছি, এ জন্য নাকি ডবল সওয়াব পাওয়া যাবে। আমার শোনা কি সঠিক?***

উসমান গনী
পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।

জবাব : 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : কুরআনের হাফিয পাঠক সম্মানিত ফেরেশ্তাদের মর্যাদাতুল্য। আর খুব কষ্টদায়ক হওয়া সত্ত্বেও যে বারবার কুরআন পাঠ করে সে দিগুণ প্রতিদান পাবে– ***(সহীহুল বুখারী- হা. ৪৯৩৭)***। অর্থাৎ- কষ্টদায়ক ও তিলাওয়াতের জন্য দিগুণ প্রতিদান পাবে। তবে উচ্চারণগত ভুলের কারণে অর্থ বিকৃত হয়ে গেলে সেভাবে পড়া সঠিক হবে না। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***আমি জানি যে, মালাকুল মউতসহ সকল ফেরেশ্তা মৃত্যুবরণ করবেন। আমার প্রশ্ন হলো– ফেরেশ্তাদেরও কি পুনরায় জীবিত করা হবে?***

আয়েশা সিদ্দিকা
পরশুরাম, ফেনী।

জবাব : ফেরেশ্তাগণও মৃত্যুবরণ করবেন। আর তাঁদেরকে মানুষ ও জিন্ জাতিকে উত্থানের আগে পুনর্জীবিত করবেন। মানুষ ও জিন্নের হিসাব হবে; ফেরেশ্তাদের কোনো হিসাব হবে না। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১১) : ***অনেক আলেম বলেন যে, গণতন্ত্র ইসলাম সমর্থন করে না। সমাজতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কী? সংশয় দূর করতে অনুরোধ করছি।***

জোবায়ের আলম
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।

জবাব : গণতন্ত্র তথা সংখ্যা গরিষ্ঠতা সঠিকতার মাপ-কাঠি এমন নীতি ইসলাম সমর্থন করে না। ঠিক তেমনিভাবে সমাজতন্ত্র মানব রচিত মতবাদ ইনসাফ পরিপন্থী হওয়াসহ নানাবিধ সমস্যার কারণে ইসলাম সমর্থন করে না। আর রাজতন্ত্র বলা হয়– যে সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন। যেমন- ইসলামী শাসনে 'উমাইয়া ও 'আব্বাসীয় যুগের শাসন ব্যবস্থা এবং বর্তমান সৌদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশ। এ রাজতন্ত্রে দু'টি দিক রয়েছে– প্রথম, যদি রাজ পরিবারের মুসলিম ও যোগ্য ব্যক্তিগণ রাজা হন এবং শাসন ব্যবস্থা ইসলাম তথা কুরআন ও সুন্নাহ হয়, তাহলে এমন রাজতন্ত্র ইসলাম পরিপন্থী নয়। আর যদি অযোগ্য ব্যক্তিগণ রাজা হয় এবং শাসন ব্যবস্থা ইসলাম তথা কুরআন ও সুন্নাহ না হয়, তাহলে এমন রাজতন্ত্র ইসলাম পরিপন্থী। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১২) : ***রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজ তত্ত্বাবধানে কয়টি মসজিদ তৈরি করেছেন এবং সেগুলো কোন কোন মসজিদ?***

কোরবান আলী
ডেমরা, ঢাকা।

জবাব : যতটুকু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজ তত্ত্বাবধানে দু'টি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। মসজিদে কুবা ও মসজিদে নববী।

জিজ্ঞাসা (১৩) : ***এই প্রচণ্ড শীতে স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর গোসল করা অসম্ভব প্রায়, এক্ষেত্রে কেবল ওযূ করে ফজরের সালাত আদায় করতে পারব কি? আমি শুনেছি ওযূ করলে গোসল করতে হবে, নয়তো তায়াম্মুম করতে হবে। সঠিক সমাধান আশা করছি।***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

জবাব : প্রচণ্ড শীতের কারণে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে এবং গরম করার কোনো উপায় না থাকলে যতটুকু সম্ভব পরিচ্ছন্ন হয়ে ওযূ করতে সক্ষম হলে ওযূ করবে, অতঃপর গোসল করতে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে। অতঃপর সুযোগ মতো গোসল করবে– ***(সূরা আন্ নিসা : ৪৩; সূরা আল মায়িদাহ্ : ০৬; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৩৩৪, সহীহ)***। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৪) : ***মুরগি বা ছাগল জবাই করার সময় কাপড়ে রক্ত লেগে গেলে সেই কাপড়ে সালাত আদায় করা যাবে কি?***

মনিরুল ইসলাম
বেনাপোল, যশোর।

জবাব : মুরগি, ছাগল ও গরু ইত্যাদি হালাল প্রাণী যবেহ করার সময় প্রাণ বের হওয়ার পূর্বে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা হারাম ও নাপাক। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيْ مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾

"বলো, আমার নিকট যে ওয়াহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর উপর কোনো হারাম পাই না, যা সে আহার

করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের গোশ্ত হয় (তা হারাম)। কারণ, নিশ্চয়ই তা অপবিত্র...।" *(সূরা আল আন'আম : ১৪৫)*

সুতরাং হালাল প্রাণী যবেহ করার সময় প্রবাহিত রক্ত যেমন খাওয়া হারাম, তেমনই নাপাক। কাপড়ে লাগলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে। জান বের হওয়ার পর রক্ত বের হলে এবং তা কাপড়ে লাগলে নাপাক হবে না। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৫) : ***গরু দিয়ে 'আক্বীক্বাহ্ করা যাবে কি? আমি শুনেছি সন্তান জন্মের সপ্তম দিন পার হওয়ার পর আর 'আক্বীক্বাহ্ দেওয়া যাবে না। এটা সঠিক?***

আসাদুল ইসলাম
তানোর, রাজশাহী।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

«عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».

ছেলের জন্য দু'টি সমমানের ও মেয়ের জন্য একটি ছাগল 'আক্বীক্বাহ্ দিতে হবে। ***(সুনান আবূ দাঊদ- হা. ২৮৪২, হাসান)***

অতএব 'আক্বীক্বার প্রাণী হলো– ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা জাতীয়। উট, গরু-সুন্নাহদ্বারা প্রমাণিত হয়নি। যদিও কেউ জায়েয মনে করেছেন, আবার অনেকে নিষেধ করেছেন। ইবনু উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, উট বড় প্রাণী হলেও তার চেয়ে 'আক্বীক্বার জন্য ছাগল উত্তম। কারণ 'আক্বীক্বার জন্য হাদীসে ছাগল প্রমাণিত হয়েছে। উট প্রমাণিত হয়নি। ***(শরহুল মুমতি- ৭/৪২৪ পৃ.)***

'আক্বীক্বার সুন্নাতী সময় হলো জন্মের সপ্তম দিনে। তবে কোনো কারণবশত যদি কেউ যথা সময়ে 'আক্বীক্বাহ্ দিতে না পারে, তাহলে সপ্তম দিনের পরেও 'আক্বীক্বাহ্ দেয়া বৈধ হবে। কারণ হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, নবী (ﷺ) নবুওয়াতের পরে নিজের 'আক্বীক্বাহ্ দিয়েছেন।

"عق عن نفسه بعدما بعث نبيا".

নবী (ﷺ) নবুওয়াত লাভের পর নিজের 'আক্বীক্বাহ্ দিয়েছেন– ***(সিলসিলা সহীহাহ্- হা. ২৭২৬)***। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৬) : ***মক্কা বিজয়ের পর জন্মভূমি ছেড়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেন পুনরায় মদীনায় ফিরে গেলেন? মদীনার যে গৃহে তিনি বাস করতেন, তা কি তাঁর ক্রয়কৃত না-কি কেউ তাঁকে উপঢৌকন দিয়েছিল?***

নাজমুল নাঈম
কাউনিয়া, রংপুর।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন এবং মক্কাবাসী সাহাবীগণও সম্পদ-স্বজন সবকিছু ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের নিয়ে একটি শক্তিশালী সমাজ গড়ে তোলেন। এছাড়াও মক্কা হতে মদীনায় হিজরত হয়েছে মহান আল্লাহর নির্দেশে, আবার মক্কায় ফিরে যেতে হলে মহান আল্লাহর নির্দেশের প্রয়োজন। মহান আল্লাহর কোনো নির্দেশ না থাকায় মক্কা বিজয়ের পর আবার মদীনায় ফিরে আসেন।

মসজিদ নির্মাণের পর তার পাশে পৃথক জমিতে নিজ কক্ষ ও স্ত্রীগণের নিবাস তৈরি করেন। পরবর্তীতে মসজিদ সম্প্রসারণের সময় তা অধিভূক্ত করা হয়। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আবূ বক্র ও 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র কবর অতিরিক্ত তিনটি প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা হয়, যাতে কেউ সেটিকে মসজিদ মনে না করে। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৭) : ***জনৈক মহিলা কোনো প্রকার তালাক ছাড়াই পরকীয়া করে অন্য এক যুবকের সাথে বিয়ে করে সংসার শুরু করে। কিছুদিন সংসার করার পর সে পুনরায় পূর্বের স্বামীর ঘরে ফিরে আসে। বর্তমানে তারা পূর্বের ন্যায় সংসার করছে। এ বিষয়ে শরঈ ফয়সালা জানিয়ে বাধিত করবেন।***

আসাদুল্লাহ আল গালিব
বাগেরহাট।

জবাব : উক্ত মহিলার দ্বিতীয় বিবাহ সম্পূর্ণ অবৈধ-হারাম। এ কারণে শরীয়তে বড় শাস্তিযোগ্য অপরাধী। পূর্বের স্বামীর বিবাহ বহাল রয়েছে। স্বামীর রুচিবোধ হলে রাখতে পারে অথবা বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। আমাদের সমাজে যেহেতু শরীয়াতের শাস্তি প্রয়োগের সুযোগ নেই, ফলে তার উচিত দ্রুত মহান আল্লাহর কাছে সত্যিকার তাওবাহ্ করা এবং ভালো পথে ফিরে আশা। –ওয়াল্লাহু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (১৮) : ***আজকাল বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সজেন্ডার বা লিঙ্গ পরিবর্তন করা হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– (ক) পুরুষ বা নারী পরস্পরকে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করা। (খ) হরমন প্রয়োগ বা অপারেশন করে লিঙ্গ পরিবর্তন করা। (গ) বিপরীতমুখী বেশভূষা ধারণ করে নিজেকে উপস্থাপন করা। এরূপ ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী মানুষদের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াতের হুকুম দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।***

আবু আব্দুল্লাহ আহমদ
টাঙ্গাইল।

জবাব : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতির মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার বা লিঙ্গ পরিবর্তন করা ইসলামী শরীয়াতে বড় ধরনের অপরাধ। যা সম্পূর্ণ হারাম ও অভিশপ্ত কর্ম।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) قَالَ : «لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ».

‘আব্দুল্লাহর ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মেয়েদের বেশধারী পুরুষদের প্রতি এবং পুরুষের বেশধারী নারীদের প্রতি লানত বর্ষণ করেছেন– *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৮৮৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে–

لَعَنَ النَّبِيُّ (ﷺ) الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

নবী (ﷺ) পুরুষ হিজরাদের প্রতি এবং পুরুষের বেশধারী নারীদের প্রতি লানত করেছেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৫৮৮৬)*

আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি বিকৃতিমূলক এরূপ কর্ম মূলত জাতি ধ্বংসের কর্ম। এ জন্যই ইবলিসের প্রতিজ্ঞা ছিল আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি বিকৃতির নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করা, ক্ষতিগ্রস্ত করা। আল্লাহ তা‘আলা ইবলিসের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন :

﴿لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ○ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ○ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ○ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾

“আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন; এবং শয়তান বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের হতে এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্রান্ত করব, তাদেরকে কু-মন্ত্রণা দিব এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে। যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শয়তান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে না। তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং সেখান হতে তারা পালাবার কোনো জায়গা পাবে না।” *(সূরা আন্ নিসা : ১১৮-১২১)*

আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক ইবলিস অভিশপ্ত হওয়ায় ইবলিস প্রতিজ্ঞা করে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কর্মসূচি বেছে নেয় যার অন্যতম হলো– সৃষ্টির বিকৃতি করা। আর ট্রান্সজেন্ডার বা লিঙ্গ পরিবর্তন করা হলো আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি বিকৃতি করা। এটি অভিশপ্ত কর্ম, যার পরিণতি জাহান্নাম তাও আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। –ওয়াল্লাহু আ‘লাম।

জিজ্ঞাসা (১৯) : আমি জানি যে, মসজিদ নির্মাণে যাকাতের টাকা গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু সুদখোর ঘুষখোর ও বিধর্মীদের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল।

জবাব : সাধারণত যাকাতের টাকা স্বচ্ছ না হওয়ার কারণে মসজিদে ব্যবহার করা হয় না। অনুরূপ সুদখোর ঘুষখোর ও বিধর্মীরা যদি তাদের অপবিত্র টাকা দিয়ে থাকে তাও গ্রহণ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র, আর পবিত্র ছাড়া তিনি কবুল করেন না। *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৯৩, মা. শা., হা. ৬৫/১০১৫)*

জিজ্ঞাসা (২০) : কেউ যদি দুনিয়াবী ক্যারিয়ার গঠনের উদ্দেশ্যে মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া করে এবং বাড়তি রোজগারের উদ্দেশে বক্তৃতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, তা কি ঐ শিক্ষার্থীর জন্য বৈধ হবে?

প্রকৌশলী আবু আজমাঈন
উত্তরা, ঢাকা।

জবাব : না, কোনোটাই বৈধ হবে না। সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

«مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে জ্ঞান অর্জন করা হয় তা যদি দুনিয়াবী স্বার্থে হাসিলের জন্য কেউ অর্জন করে তাহলে কিয়ামত দিবসে সে জান্নাতের সুগন্ধিও লাভ করবে না। *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ৩৬২৩, সহীহ)*

অতএব প্রশ্নে বর্ণিত কাজটি বড় অপরাধ, এ জন্য জান্নাত হতে বঞ্চিত হবে। তবে কেউ যদি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উক্ত কাজগুলো করে, অতঃপর দুনিয়াবী স্বার্থও অর্জন হয় এতে অসুবিধা নেই। –ওয়াল্লাহু আ‘লাম। ❑

প্রচ্ছদ রচনা

আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংভুক্ত সৌদি আরবের শীর্ষ দশ ইউনিভার্সিটি

–আব্দুল মোহাইমেন সাআদ*

[চতুর্থ পর্ব]

কিং সউদ বিন আব্দুল-আজিজ ইউনিভার্সিটি ফর হেলথ সায়েন্স

আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগের মালভূমি নজদ অঞ্চলে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে বিশেষায়িত সর্বোচ্চ র‍্যাংকিং অর্জনকারী একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিং সউদ বিন আব্দুল-আজিজ ইউনিভার্সিটি ফর হেলথ সায়েন্স। মূল ক্যাম্পাস রিয়াদ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়টির আরও দু'টি ক্যাম্পাস রয়েছে জেদ্দা ও আল-আহসায়। মূল ক্যাম্পাস রিয়াদে। কলেজ অফ মেডিসিন, কলেজ অফ ডেন্টিস্ট্রি, কলেজ অফ ফার্মেসি, কলেজ অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড হেলথ ইনফরমেটিক্স, কলেজ অফ নার্সিং, জেদ্দা ক্যাম্পাসে কলেজ অফ অ্যাপ্লাইড মেডিকেল সাইন্স, কলেজ অফ মেডিসিন। আল-আহসা ক্যাম্পাসে কলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড হেলথ প্রফেশন্স, কলেজ অফ নার্সিং সহ বিশ্ববিদ্যালয়টির অধীনে রয়েছে প্রায় চৌদ্দটি কলেজ। যা শিক্ষার্থীদের কাছে মেডিসিন, সার্জারি, অ্যানাস্থেসিওলজি, রেডিওলজি, এপিডেমিওলজি, পাবলিক হেলথ, স্পিচ থেরাপি এন্ড অডিওলজিসহ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্বমানের স্নাতক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশ্ববিদ্যালইয়ের নাম করন করা হয়েছে আধুনিক সৌদি আরবের দ্বিতীয় রাজা, বাদশাহ সৌদ বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের নামে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ০৬ মার্চ ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের তৎকালীন শাসক খাদেমুল হারামাইন শরিফাইন 'আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদের রাজকীয় আদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৩,০০০-এর বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের সেরা ১০০০ বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৌদি আরবের সেরা ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। কিং সৌদ বিন আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটি ফর হেলথ সায়েন্স তার একাডেমিক সহযোগিতার জন্য ইউনিভার্সিটি অফ সিডনি (অস্ট্রেলিয়া) লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় (ইউকে) দক্ষিণ আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ফ্লিন্ডার ইউনিভার্সিটি (অস্ট্রেলিয়া) ইউনিভার্সিটি অফ আরকানসাস (ইউএসএ) থমাস জেফারসন ইউনিভার্সিটি (ইউএসএ) ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড (ইউএসএ) মাস্ট্রিচ ইউনিভার্সিটি (নেদারল্যান্ডস) দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ওকলাহোমা (ইউএসএ) এবং ইউনিভার্সিটি অফ টেনেসি হেলথ সায়েন্স সেন্টার (ইউএসএ) রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (কানাডা)-সহ বিশ্বব্যাপী স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে বেশ কয়েকটি চুক্তি করেছে।

এক নজরে কিং সউদ বিন আব্দুল-আজিজ ইউনিভার্সিটি ফর হেলথ সায়েন্স

* গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংক (২০২৩) : ৬০১-৮০০।
* আরব বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংক (২০২৩) : ২৮।
* সৌদিআরব বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংক (২০২১) : ০৭।
* ধরণ : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।
* স্নাতক শিক্ষার্থী সংখ্যা : ১০,৩৯৫।
* স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী সংখ্যা : ২৬৭১।
* প্রতিষ্ঠিত সাল : ২০০৫।
* স্থান : রিয়াদ, জেদ্দা, আল আহসা, সৌদি আরব। ❑

* *শিক্ষার্থী, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা।*

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহি.) বলেন :

اياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي عليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل.

"সাবধান! তোমরা মহান আল্লাহর দীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকো। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" (শা'রানী- মীযানে কুবরা- ১/৯ পৃ:, মুস্তাদরাক হাকিম- ১/১৫)

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও সালাত টাইম-এর সময় সমন্বয়ে ঢাকা জেলার

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি

জানুয়ারি

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫:১৬	০৬:৪০	১২:০৩	০৩:০৩	০৫:২৪	০৬:৫৪
০২	০৫:১৬	০৬:৪০	১২:০৩	০৩:০৩	০৫:২৫	০৬:৫৫
০৩	০৫:১৬	০৬:৪১	১২:০৪	০৩:০৪	০৫:২৫	০৬:৫৫
০৪	০৫:১৭	০৬:৪১	১২:০৪	০৩:০৪	০৫:২৬	০৬:৫৬
০৫	০৫:১৭	০৬:৪১	১২:০৫	০৩:০৫	০৫:২৭	০৬:৫৭
০৬	০৫:১৭	০৬:৪১	১২:০৫	০৩:০৬	০৫:২৭	০৬:৫৭
০৭	০৫:১৮	০৬:৪২	১২:০৫	০৩:০৬	০৫:২৮	০৬:৫৮
০৮	০৫:১৮	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৭	০৫:২৯	০৬:৫৯
০৯	০৫:১৮	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৮	০৫:২৯	০৬:৫৯
১০	০৫:১৮	০৬:৪২	১২:০৭	০৩:০৮	০৫:৩০	০৭:০০
১১	০৫:১৮	০৬:৪২	১২:০৭	০৩:০৯	০৫:৩১	০৭:০১
১২	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১০	০৫:৩১	০৭:০১
১৩	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১০	০৫:৩২	০৭:০২
১৪	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১১	০৫:৩৩	০৭:০৩
১৫	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:১১	০৫:৩৪	০৭:০৪
১৬	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:১২	০৫:৩৪	০৭:০৪
১৭	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:১৩	০৫:৩৫	০৭:০৫
১৮	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:১০	০৩:১৩	০৫:৩৬	০৭:০৬
১৯	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:১০	০৩:১৪	০৫:৩৭	০৭:০৭
২০	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:১০	০৩:১৫	০৫:৩৭	০৭:০৭
২১	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:১১	০৩:১৫	০৫:৩৮	০৭:০৮
২২	০৫:১৯	০৬:৪২	১২:১১	০৩:১৬	০৫:৩৯	০৭:০৯
২৩	০৫:১৯	০৬:৪১	১২:১১	০৩:১৭	০৫:৩৯	০৭:০৯
২৪	০৫:১৯	০৬:৪১	১২:১১	০৩:১৭	০৫:৪০	০৭:১০
২৫	০৫:১৯	০৬:৪১	১২:১২	০৩:১৮	০৫:৪১	০৭:১১
২৬	০৫:১৯	০৬:৪১	১২:১২	০৩:১৮	০৫:৪২	০৭:১২
২৭	০৫:১৮	০৬:৪০	১২:১২	০৩:১৯	০৫:৪২	০৭:১২
২৮	০৫:১৮	০৬:৪০	১২:১২	০৩:১৯	০৫:৪৩	০৭:১৩
২৯	০৫:১৮	০৬:৪০	১২:১২	০৩:২০	০৫:৪৪	০৭:১৪
৩০	০৫:১৮	০৬:৩৯	১২:১৩	০৩:২১	০৫:৪৪	০৭:১৪
৩১	০৫:১৮	০৬:৩৯	১২:১৩	০৩:২১	০৫:৪৫	০৭:১৫

সৌদি আরবের শীর্ষ ১০ ইউনিভার্সিটির অন্যতম এবং আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংভুক্ত কিং খালিদ ইউনিভার্সিটির সাবেক সনামধন্য শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম কর্তৃক পরিচালিত

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সাভারে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষালয়

মাদরাসাতুল হাসানাহ

ভর্তি চলছে

আপনার সোনামণির সুশিক্ষার নিরাপদ ঠিকানা

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

বালক ও বালিকা পৃথক শাখা

আমাদের নিয়মিত অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম

- **তাহফীজুল কুরআন**
  মক্তব । নাজেরা । হিফজ । রিভিশন
- **ইসলামী শিক্ষা বিভাগ**
  হিফজসহ প্লে-অষ্টম শ্রেণি
  (ক্রমশ উচ্চতর পর্যায়)
- **উন্মুক্ত গণশিক্ষা প্রোগ্রাম**
  আধুনিক ভাষা শিক্ষা কোর্স
  ইসলামী শরীয়ার বিষয়ভিত্তিক কোর্স
  কুরআন শিক্ষা
  দারসুল হাদীস প্রোগ্রাম

পরিচালনায়

অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম
Adjunct Faculty
Manarat International University.
Former Faculty
King Khalid University &
University of Bisha, KSA.

বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা।
01894762337, 01973936173

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER ATAB MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ৭০ নয়াপল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৩৩৪২৮০, ৯৩৩৩৫৮৬, মোবা: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫
চাঁপাই নবাবগঞ্জ অফিস: বড় ইন্দারা মোড়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭১১-৫৯১৫৭৫

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত